চলো
টিটির
সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অনন্য প্রকাশন : ৬৬ কলেজস্ট্রীট (দ্বিতল)
কলকাতা-৭৩

॥ প্রকাশক ॥
হীরক রায়
৬৬, কলেজস্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীঅজিত চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

॥ প্রচ্ছদ ॥
অরুণ চক্রবর্তী

মূল্য আট টাকা

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

চলো তিতির সঙ্গে

তাতারকে

চলো তিতির সঙ্গে

ওর তিতি নামটি কেমন করে হলো সে গল্পটাই আগে বলি। তারপর তো ও তোমাদের সঙ্গী, কিংবা তোমরা ওর সঙ্গে কোথায়
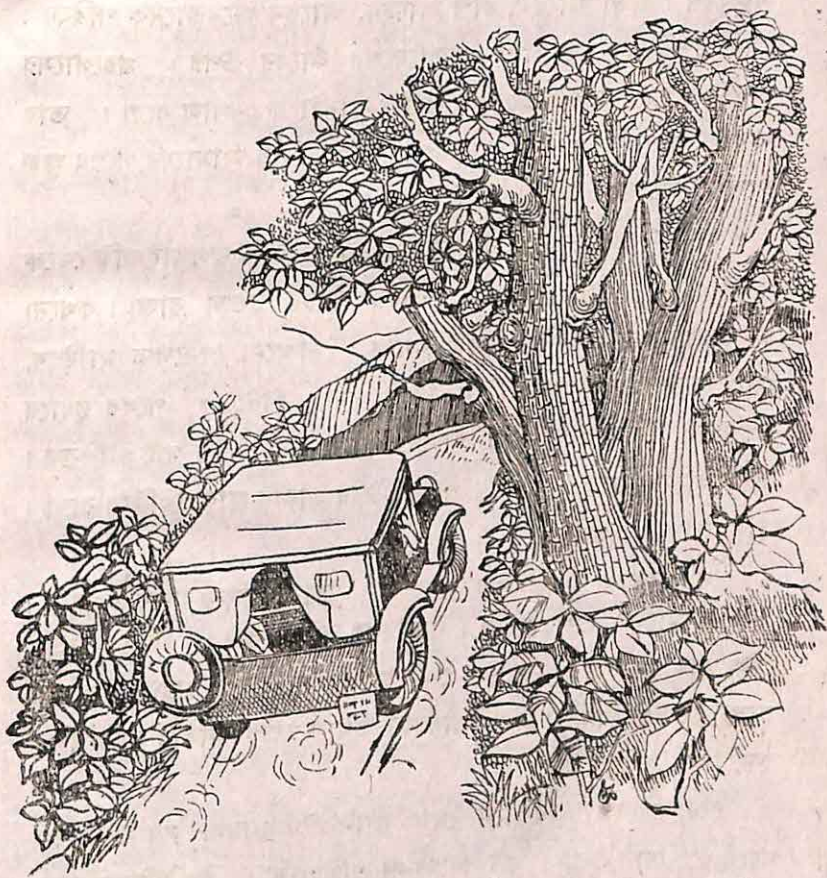
না কোথায় ভেসে চলবে। ভেসে চলবে নৌকোয়, জাহাজে। ছুটে যাবে রেলগাড়ি, মোটরে, জিপে। যাবে কোথায়? কখনো জলে

-জঙ্গলে নদী-নালায় কখনো পাহাড় উপত্যকায়। কখনো কোন অভয়ারণ্যে, কখনো ভয়ানক অরণ্যে। এইভাবে কখনো ও তোমাদের সঙ্গী। কখনো তোমরা ওর সঙ্গে।

খরগোসের দুটো কানের একটা কান হলো ভুটান। ভারতবর্ষের বন্ধু দেশ। রাজা আছেন, রাণী আছেন, আছেন অনেকানেক পরিষদ। সেই দেশটি ঠিক তোমার বাংলাদেশের কাঁধের উপর। খরগোসের একটা কানের মতো জেগে। বাকি কানটাকে নেপাল ধরো। তার কথায় পরে আসা যাবে। এখন যাকে নিয়ে আমাদের গল্পের শুরু হতে যাচ্ছে, তার কথায় আসি।

পাহাড়ে জঙ্গলে-ভরা ঐ ভুটানের একটা দিক জলপাইগুড়ি থেকে খুবই কাছে। বাস আছে। সুন্দর পীচের চওড়া রাস্তা। কখনো চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কখনো ধানক্ষেত মাড়িয়ে, ছোট বড় ঝোপের উপর দিয়ে ডিঙি মেরে হাঁটছে? পথের দুধারে শিশুগাছ, শিরীষগাছ আর শাল সেগুন। চেনা গেরস্ত গাছও বিস্তর। আম কাঁঠাল জাম। গোটা পথের উপর ছায়ার জাল বিছিয়ে রাখা। ছায়া আর আলোর।

সেই সুন্দর মিঠে পথ ধরে বাস তোমায় নিয়ে যাবে চামুরচি। ওটা আমাদের দেশের সীমা। তারপর ভুটান শুরু। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক তার পরেই কিন্তু ভুটান শুরু হতে পারেনি। তোমরা অবাক হচ্ছো তো? ভাবছো এ আবার কী কথা? তাই আবার হয় নাকি? হয়, কিন্তু সত্যিই হয়।

দুটো দেশের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা সব সময় পড়ে থাকে। তার নাম 'কেউ-কারুর-না জমিদারি'। ইংরিজিতে যাকে বলে 'নো ম্যানস ল্যানড।' চামুরচি আর সামচির ঠিক মাঝখানে এমনি খানিকটা ফাঁকা জমি আছে। এই ফাঁকা জমি ভর্তি আছে

বুনো জংলা শটি ক্ষেতে। তারপর পথ পেঁচিয়ে উঠেছে পাহাড়ে। পীচের পথ। একদিকে পাইন গাছের সারি। অন্যদিকে খাদ। এলোমেলো হাওয়া। মনে হবে পাহাড়ে কে যেন সদাসর্বদা কেঁদে ফিরছে। পাইনবনের ফাঁকে বাতাস এমনি করেই কাঁদে। আগে ভাগে জেনে রাখলে আর ভয় করে না। ভাবনা হয় না।

সিঁড়িভাঙা অংকের মতন চাষবাস আর ঘরবাড়ি ছড়িয়ে। বনের ভিতর থেকে হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে মনে হবে তোমার। তুমিও যেতে যেতে উঁকি মেরে দেখছো। এভাবে লুকোচুরি উঁকি-ঝুঁকি দিতে দিতে পৌঁছুবে গিয়ে সামচির বাজার অঞ্চলে।

টাকের মতন, টেবিলের মতন, ফাঁকা মাঠ একটি। তার তিনপাশে বাঁধা ঘরবাড়ী। আকারে ছোট। সবই দোকান। খাবার জায়গা বিশেষ নেই। সবাই ওখানে বেড়াতে যায়। ওখানে একটি নদী আছে। বর্ষায় ভয়ানক হাঁকডাক তার। শীতে শান্ত। প্রায় নির্জলা নদী। চওড়া বুক জুড়ে কেবল পাথর আর পাথর। ছোট বড়ো সেজো মেজো পাথর। কী তাদের রঙ-বর্ণ। কী তাদের ছুরৎ। দেখলে চোখ জুড়োয়।

সেই খাদে দল বেঁধে নেমে হয় চড়িভাতি। উত্তর বাংলার ইস্কুল পাঠশালা ট্রাকভর্তি হয়ে ডায়নার খাদে গোটা দিন হৈ হৈ হুল্লোড় করে সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরে।

পড়ে থাকে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, শুকনো শালপাতার রাশি। এলোমেলো হাওয়ায় সেই দিনের স্মৃতি রাতভরা ওড়ানো পোড়ানো থাকে। পাইনের বনে কে যেন কেঁদে বেড়ায় গোটা রাত।

সামচিতে ভারতের জিওলজিক্যাল সারভের একটি অফিস আছে। ভুটানের হয়ে এরা কাজ করতে এসেছে। ভুটানের মাটির তলায় আছে অজানা কতো দামি পাথর। এরা সেই পাথরের খোঁজ দিচ্ছে। কীভাবে তুলতে হবে পাতাল থেকে মর্তে, তার উপায় বাতলাচ্ছে। হিসবে করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে একদল বাঙালী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। ঘরবাড়ি আছে। অতিথিশালাও আছে। তবু সবার ঘরই অতিথিশালা। কারুর দোরে গিয়ে দাঁড়ালে সে হাতে চাঁদ পাবে।

এই সামচি থেকে একজনের মা-বাবা জিপে করে বেরিয়ে পড়লো। সেই একজনের নাম এক্ষুনি আর বললাম না। পরে তো বলতেই হবে। তোমরা আন্দাজ করতে থাকো ততক্ষণ।

মা-বাবা চললো সেই একজনের বাবা যিনি, তারই বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর নাম ধরো মমাতি। মমাতি যার নাম তার কাজই হলো মাটির নিচেকার সলোমনের রত্নখনির সন্ধান করে বেড়ানো। খোঁজ দেওয়া। কী করে বা পাতাল থেকে তুলে আনা যাবে তা বুদ্ধি খাটিয়ে বের করা।

অনেক জঙ্গল থরে থরে কেটে যাওয়া ভেলার মতন। চা বাগান পার হয়ে তারা চলছে তো চলছেই। সেই কোন্ সকালে দুমুঠো ভাত ডাল পেটে ফেলে বেরিয়েছে এখনো থামার নামটি নেই। জিপগাড়ী ছুটেছে তো ছুটেই চলেছে। কচিৎ দেখা যাচ্ছে লোকজন। নদী পার হচ্ছে নদীর বুকে নেমে পড়ে। পাহাড় পার হচ্ছে পাহাড়ের বুকে ঝাঁপ দিয়ে। এ আবার কেমন যাওয়া রে বাপু। যাচ্ছেই বা কোথায়? সামনে শুধুই বন-জঙ্গল। জঙ্গলের পিছনে সরস্বতী ঠাকুরের পিছনকার তৈরী পাহাড়ের মতন খেলনা পাহাড়ের দাগ। নীল-কালো দাগ সমস্ত। সবই নাকি ভুটান পাহাড়। আলাদা আলাদা নামও হয়তো আছে। কিন্তু তা এতোই খটোমটো যে, বারবার শুনেও মনে থাকে না। ভাষাটাই যে কেমন কেমন!

সেই একজনের বাবা-মা এবং বাবার বন্ধু, যিনি নাকি সলোমনের রত্নখনির সন্ধানে আছেন, তাঁরা তিনজন একটা সময়, এই দুপুর গড়িয়ে বিকেলে, গাড়ি থেকে ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়লেন।

এই নদীটা হেঁটে পার হতে হবে আমাদের।

তাই হোক। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। গা গতর পাথর হয়ে গেছে।

এই নাকি নদী ! জলের বিন্দু বিসর্গ ও কোথায় নেই। খাত ভর্তি ইয়া বড় বড় সব পাথর। জলে ধাক্কা খেতে খেতে গা-তেলানো পাথর সব। তারই মধ্যে হুড়মুড়িয়ে জিপ থেমে গেলো। পিছনে ডাঁই করা সব বস্তা সুটকেশ তোরঙ্গ তেরপল—আরো সব কী কী যেন।

নদীর এপার থেকে ওপার বেশিক্ষণের না। মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা পথের রেখা যেন। রত্নখনির খোঁজে তো আর কেউ একা আসতে পারে না ! তাই সাথীরা আগেভাগে এসে বসে আছে। পরে শোনা গেছে, ওরা নাকি ছ-মাসের উপর আছে এই জঙ্গলে। মানুষ চোখে পড়ে না। জন্তু-জানোয়ার কিন্তু চোখ মেললেই দেখা যায়।

জায়গাটার চতুর্দিকেই খাড়া পাহাড়। মাঝখানটায় গর্ত মতন। সেই গর্তের একপাশে সাদা একফালি চেঁড়া কাপড়ের মতন নদীটি। বাতাস আছে। বাতাসে শীতের কাঁটাও আছে। রোদ্দুর গাছপালার মাথায় ঘুড়ির মতন আটকে।

নদীর যে-পারে থাকা হবে তার সর্বত্র চন্দনের বন, খয়েরের বন ! চাষ করা হয়েছে। বুনো জংলা কিছু নয়। সেই বন পার হয়ে ঘরে জানালা আছে। ক্যাম্পখাট আছে। আলোর ব্যবস্থা আছে। আয়না আরশি সমস্তই লাগানো।

জনৈকা বের হয়ে এসে স্বাগত জানালেন। এঁরই অন্য অর্ধের নাম যযাতি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একবাটি করে চা। পাপরভাজা। কাঁচালঙ্কা ভাজা।

রাতে কিন্তু শুধু মুরগির ঝোল আর ভাত। আর কিছু পাওয়া যাবে না।

জিপের পেছন থেকে দিন সাতেকের রেশন নামলো। সাতদিনে একদিন এই দুর্গম পূব-ভুটানের একাংশ থেকে সামচির সঙ্গে

যোগাযোগ। যযাতির মতন যারা, তাদের আকছারই এমন ত্যাগ করতে হয়। এখানে তো খুব ভালো। জিপে আসা গেছে। এমন জায়গাও আছে, মাইলের পর মাইল হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। তাও যে সে হাঁটা নয়, পাহাড়ের গুড়িপথ ধরে চড়াই। ক্রমাগত চড়াই। বর্ষায় মাতাত্মক হলো, বাঘ ভাল্লুক সাপখোপ না—থই থই পাহাড়ে-জোঁক। সে যে কি বিভীষিকা যাদের অভিজ্ঞতা নেই তাদের পক্ষে আন্দাজ করাও শক্ত।

পাহাড়ি লোক এই জীবটাকে ভীষণ ভয় করে।

আশ্চর্য সুন্দর এই ক্যাম্প লাইফ্‌! পিছন দিকে নদীর খাত একটা গর্ত মতন জায়গায় জল জমিয়ে রেখেছে।

জঙ্গল আর বনবাদাড়ে স্বাভাবিক আড়াল। খিড়কি পুকুরের সামনের অংশ যেন। বরফ ঠাণ্ডা জল। শিবিরবাসী যযাতি পিছন থেকে বলে উঠলো, নদীর নামটি ভারি মিষ্টি কিন্তু।

কী নাম, কী নাম?

তিতি। তিতি। খুব মিষ্টি নাম না?

মিষ্টি মানে চমৎকার। নিশ্চয় কোনো মানে আছে কথাটার?

মানে? যযাতি উদাস গলায় বলে, কোনো মানে নেই। আর মানে নাইবা থাকলো। মানে ছাড়াই কি সুন্দর!

ট্রেনে চেপে বালেশ্বরে

এ'বছর বৃষ্টি যাই-যাই করেও যায় না। সেই কবে থেকে যে ঝরুনি শুরু হয়েছে? আকাশটা ছাতার কাপড়ের মতন জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেলো নাকি? ক'দিন হলো ঢাকে কাঠি পড়েছে। রাস্তাঘাটের পিচ চটিয়ে পোঁতা হচ্ছে বাঁশ। বাতা মারা শুরু হয়েও
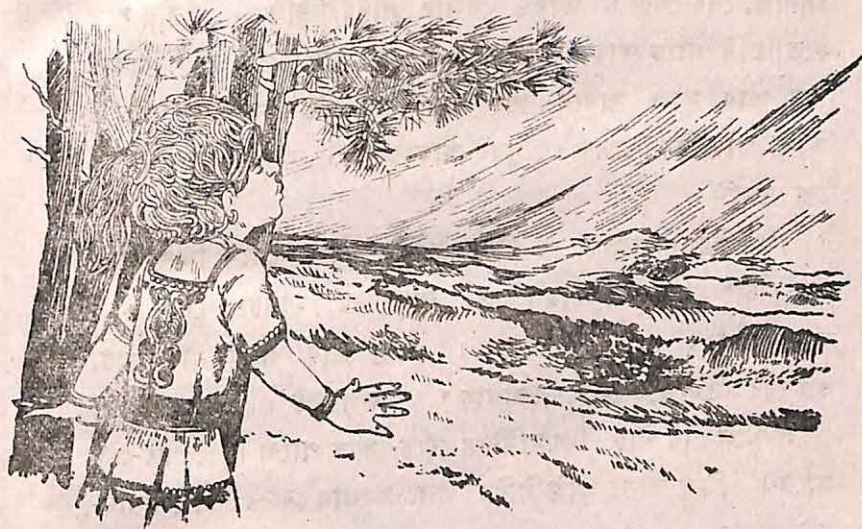
গেছে। মণ্ডপের কাঠামো তৈরি শেষ। দোকানের জামা কাপড় ফুটপাতে। ফুটপাত ছাড়িয়ে পথের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দর্জির দোকানে পা ফেলার জায়গা নেই। জুতোর দোকান চাপঠাসা। ভিড় ভিড়। সর্বত্র ভিড় উপচে পড়ছে। তারই মধ্যে পড়ছে ঝুরুক ঝুরুক জল! জলের কামাই নেই। আবার সপ্তমী পূজোরও আর দেরি নেই বিশেষ।

তিতি ফি-বছর পূজোতে বেরোয়। গতবছর কাশ্মীর সেরে এসেছে! তার আগের বছর গোয়া। তারও আগের পূজোয় বাড়ির

কাছাকাছি ঘুরেছে বিস্তর! বাংলো থেকে বাংলো চষে বেড়িয়েছে। আরও আগে নেপাল-কাঠমানডু। সবই পূজোতে তিতির। বয়স-বা কতোই? এর মধ্যে হিললি-দিললি সবই প্রায় সারা। কাছে দূরে কোন্‌টা বাদ আছে তার? শিলং থেকে গৌহাটি, গৌহাটি থেকে ডুলিয়াজান। সেখান থেকে ডিমাপুর হয়ে কোহিমা। কোথায় না গেছে সে? এই দারজিলিং, তো ঐ গোপালপুর! পুরী দীঘায় বারকতক। কাজিরাঙা গরুমারা জলদাপাড়া সমস্ত তার নখদর্পণে। এমনকি, সেই খৈরী। তারও খেলার সাথী তিতি। খৈরীর সঙ্গে কতো ছবি আছে তার। খৈরীর পিঠে হাত বুলোনো! মাংস খাবার সময় তার মুখের সামনে বসে থাকা। খৈরীর বাড়িতেই তিতি ছিলো প্রায় দিন তিনেক। খুবই কাছাকাছি। বন্ধুরা যেমন থাকে, ঠিক তেমনি।

গিয়েছিলো বালেশ্বর। ট্রেনে চেপে। সেখান থেকে জিপ গাড়ি চড়ে সটাং সুমুদ্দুরের ধার। তা সুমুদ্দুরের নামটা যেন কী? বঙ্গোপসাগর। নাম তো হলো। কিন্তু তার অমন নীল রংটা কপ্পুরের মতন উবে গেলো কোথায়? খুব জল নেই। নোনা জলে পা ফেলে-তুলে চার পাঁচ কিলেমিটার হেঁটে যেতে পারো। স্রোত-ঢেউ আছে। কিন্তু তাতে কুস্তিগিরির প্যাঁচ-পয়জার নেই। পালোয়ান-ঢেউ দেখবে তো চলো পুরী, চলো গোপালপুর চলো জুহু বীচে। আরো জায়গা আছে, কিন্তু তিতির মনে যা পড়ছে—এখন তখন করে তাদের নাম করবে। গুছিয়ে বলবে বড়োসড়ো মানুষেরা। সে যাই হোক। জায়গাটার নাম চাঁদিপুর। চাঁদিপুর অন-সী। উলিরুলি ঝাউ আর কাজুবাদাম। শিশুশাল আর সেগুন নারকোল। শিরীষও আছে। আদাড়-বাদাড় গন্ধ একটা নেমেই নাকে পায় তিতি। গন্ধটা কীসের ঠিক ঠাহর করতে পারে না! এর সঙ্গে মিশেল দেওয়া আঁশ গন্ধ। যেন চালের সঙ্গে কাঁকর!

উড়ো নুন। হৈ হৈ হাওয়া বাতাস! আধ ঘণ্টাও লাগেনি,

বালেশ্বর থেকে তিতি গিয়ে দাঁড়ালো স্নুমুদ্দুরের ধারে। সামনের দিকটার জল একটু কাদাগোলা। চোখ তুলে তাকাও। দূরে নীল। নীলে ভাসছে মোচার খোলার মতো মেছো নাও। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তীরের বালুজলে আর ঢেউয়ের চূড়ায়। কী রং তাদের! সীগাল-গুলো সিরাজু পায়রার মতন। পুরুষ্ট আর গোবর-গণেশ। কিছুর কিচ্ছু জানে না, চেহারা দেখেই মালুম হয়। কেমন বেচারা বেচারা ভাব। ওদের মারলে জেল-জরিমানা হয়। সব পাখি মারলেই হয় না কেন? ভাবে তিতি।

তিতির বাবার মিটিং চাঁদিপুরে। অমন মিটিং যেন রোজ-রোজ হয়। বাইরে-দূরেই হয়। তাহলে বাবার পেছন-পেছন ও যেতে পারে। সব জায়গায় অবশ্য যেতে পারে না। ইস্কুল পাঠশালা আছে তো! তাছাড়া, অনেকগুলো জায়গার নেমতন্ন রাখতে উড়ে যেতে হয় বাবাকে। উড়তে গেলে বেশ পকেটজোড়া পয়সা লাগে! ট্রেনে-বাসে হলে ওরা মাঝেমাঝেই সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ে। এই তো সেদিন ওর বাবার নেমতন্ন ছিলো শিলং-এ। বাবা লিখে পাঠালেন। না, তিনি প্লেনে যাবেন না। একদিন আগে ভাগে ট্রেনে যাবেন। সবাই তাঁর সঙ্গে যাবে। জায়গার ব্যবস্থা করতে বললেন। আর কিছু নয়। খুব ঘোরা হয়েছিলো সেবার।

তো, যা বলছিলাম! চাঁদিপুরে বাবা প্রায়ই যান। উৎকল-বঙ্গ লেখক কবিদের মিটিং ওখানে প্রায়ই হয়। তিতিরা গেছে ছুবার। একবার গিয়ে উঠেছিলো 'ক্যাজুরিনা হাউসে'। স্নুমুদ্দুরের উপর হুমড়ি খেয়ে মুখ দেখছে যেন বাড়িটি। বেশ ক'খানা বড়োসড়ো ঘর। সামনে মাথাঢাকা বারান্দা। বারান্দায় ডেক চেয়ার পাতা। সেখানে বসে স্নুমুদ্দুরের দিকে তাকিয়ে থাকো। খুব বড়ো কম্পাউন্ড।

রকমারি ফুল-ফলের গাছ। মালিরা সর্বদা মাটি খোঁচাচ্ছে। সর্বদাই পাতা কাটছে কাঁচি দিয়ে।

ময়ূরভঞ্জ রাজাদের সমুদ্র সৈকতাবাস ছিলো এই বাড়িটি।

রাজারাজড়ার ব্যাপার তো ? তাই এতো সুন্দর। এতো খোলামেলা-ভাবে তৈরি। এতো ফুল ফল চতুর্দিকে। ঝাউ আর উইলো। তখন এই একটি বাড়িই ছিলো সুমুদ্দুরের ধারে। তারপর হয়েছে অনেক ক'টাই। সরকার পর্যটকদের জন্যে টুরিষ্ট লজ করে দিয়েছে। পি-ডবলু ডি বাংলো একটা টিলার মাথায় চড়ে, যার পিছনেই সমুদ্র। আর আওয়াজ, আর নীল জল। বাংলোর পিছনের জানলা দিয়ে গাছের পাতায় কাটাছেঁড়া সমুদ্র আর বালিয়াড়ি।

ময়ূরভঞ্জের রাজারা কিন্তু এখন আর কেউ আসেন না। তাঁদের নিজের রাজত্ব বলতে তো আর কিছুই নেই এখন। সবটাই সরকারের। রাজারা থাকেন বারিপদায়। সেখানে তাঁদের বিরাট প্রাসাদ। রাজত্ব চালাতে হয় না। সরকারই সবার হয়ে রাজকার্য চালান। হয়তো কোন রাজা বা রাজপুত্র বেড়াতে আসেন। মজাটা কোথায় জানো; আমরা যেমন আসি, তাঁরাও তেমনি করে আসেন। আমাদের জন্যে যে ব্যবস্থা, তাঁদের জন্যেও তাই। ভালো না ? সবাই কেমন সমান-সমান।

এখন ক্যাজুরিনা হাউসে থাকতে গেলে বারিপদা বন দফতরে চিঠি লিখে জানতে হবে, খালি আছে কিনা। বন-বিভাগ এর দেখাশোনা করে। এখানকার বন-ও তৈরি করে বন-দফতর। ট্যুরিস্ট বাংলোর জন্যে ট্যুরিস্ট আপিস। পি-ডবলু ডি বাংলোর জন্যে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, বালেশ্বরকে লিখে অনুমতি নিতে হবে। সব জায়গায় খাবার ব্যবস্থা আছে। খাবার আর শোবার। কিচ্ছু বয়ে আনতে হবে না। বালেশ্বর পাঁচ ঘণ্টা বড়ো জোর। সেখান থেকে সমুদ্রতীর আধ ঘণ্টার ভিতরে। বাস আছে। অটোরিকশা আছে। এমনি সাইকেল রিকশাতেও বেরিয়ে পড়তে পারো। উঁচু থেকে নিচুর দিকে যাবে তো ? ফলে, দৌড়েই যাবে।

মোট তিনদিনের জন্যে থাকা। তাই সই। বাবা তো মিটিংএর বাবা। আমাদের কাছাকাছি হলেন মা আর তাতার। তাতার

আমার একরত্তি ভাই। তিন পেরিয়ে চারে পড়েছে সবে।

মা বলতেন, খুব সুন্দর ঠাণ্ডা গোছের ছেলেটা ছিলো। ওর তাতার নামটা রেখেই কাল হয়েছে। নামের ভারে ছেলেটা কেমন বেঁকেচুরে গেলো দেখলি তো?

আমি আর কী বলবো? বলা তো ঠিক না।

বাংলোটা একটা টিলার ডগায়। সামনে পীচ বাঁধানো ফাঁকা উঠোন ক্রমশ নিচে নেমেছে। পেছনে গাছপালা। দুপাশে গাছপালা। পেছনে একটা কাঁকরোকাটা সিঁড়ি। পাছ দুয়ার দিয়ে সেই পথে বালিয়াড়ি আর সমুদ্দুর। গাছপালা বলতে ঝাউ আর বাবলা। তুলো গাছও ভর্তি। কার্পাসতুলো। বাসন্তী রঙের ফুল। গুলমোহর জারুল আর কাঞ্চন। বহুৎ মরশুমি ফুল ফুটেফুটে দোল খাচ্ছে। জোর হাওয়া। হাওয়ায় বালি। মুখে হাত ঘষলে হাতের তালুতে বালি। করতালি দিলে ঝুরঝুর করে মাটিতে।

এমন চওড়া তীর কিন্তু কোথাও দেখিনি। বিশেষ করে ভাঁটার সময়। সমুদ্দুরের জল তিন চার কিলোমিটার পালিয়ে, আসল নীল জলের কোলের কাছে। আমরা কোঁচড় ভরে নুড়ি কুড়োতাম। নুড়ির নানান রং। আর ঝিনুক। আর সমুদ্দুরের ফেনা। নাঃ শাঁখ পাইনি। সমুদ্দুরের ঘোড়া যাদের বলে, তাই পেয়েছিলাম দুটো মাত্তর।

একটা ভারি মজার জিনিসের কথা বলি। গোটা ভারতে যতো-গোলা গুলি তৈরী হয়, এখানে তা বাজিয়ে নেওয়ার প্রথা পরীক্ষাগার আছে। যার ইংরেজী নাম, এ্যামুনিশন টেস্ট হাউস। সেদিকে ঢোকা বারণ। তবে, অনুমতি চেয়ে ঢোকা যেতে পারে।

বীচ্ ধরে সোজা দেড় কিলোমিটার মত গেলে বলরামগুড়ি। সেখানে একদিক থেকে সাগরে এসে মিশেছে বুড়া বড়ঙ্গ বা বুড়ি বালাম। বুড়ি বালাম জন্মেছে যে-পাহাড়ে তার নাম জানো? আমি সেখানেও বেড়িয়ে এসেছি একবার। পাহাড়-জঙ্গলের নাম

সিমলিপাল। ওড়িশার বেশ জমকালো ঘন অরণ্যের মধ্যে একটি। তার কথা পরে বলবো।

বলরামগুড়িতে মাছ ধরার মচ্ছব লাগে বছরের বেশিরভাগ সময়! তাই নদী-থিকথিক নৌকো ডিঙি। ভটভটিয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে মাছ ধরার ট্রলার। নদী পারাপারের জন্যে নৌকো লন্চ। এপার থেকে ওপারটা কি সব সময় এতো সুন্দর দেখায়?

ওখানে একটি ছোট বাজার আছে। হাটতলায় হাট বসে। মকরের সময় মেলা। লোক ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছে ছোট গঙ্গাসাগর।

জলটুশিতে ভেসে চলা

সাধারণ জেলেডিঙ্গি। একটু ছই আছে। বাতাস জলের ওপর দিয়ে আসছে বলে গরমে চৌচির হয়ে পড়ছে না কেউ। তিনি একটা তালপাতার টুপি পরেছে। তাল কি, খেজুর—ঠিক আলাদা করা যাচ্ছে না। এ ধরনের টুপির নাম ন্থুলিয়া-টুপি। ওরা যখন জলে নামে, তখনও ঐ টুপি পরে থাকে। টুপির ভেতরে থাকে বিড়ি দেশলাই—সর্বস্ব, মায় কাগজের এক টাকা দু টাকার নোট। আশ্চর্য, ভেজে না। যেমনটা ঠিক তেমনটা থাকে। টুপির ভেতর এক

ফোঁটাও জল ঢোকার উপায় নেই—এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে পাতাগুলো বোনা। ওরা নিজেরাই বোনে। যেমন, তিতি দেখছে ওরা হুড়-মুড়িয়ে কীভাবে নাইলনের জাল বোনে। একসঙ্গে চার পাঁচ জন এদিকে ওদিকে করে বসে গোটা জালটাই বুনে ফেলে। বোনার পর জোড়া লাগায়। তারপর জল বাগিয়ে সোজা সুমুদ্দুর।

এখন চিংড়ির দাম খুব। এক একটা মাঝারি মতো বাগদা দেড় দু'টাকার কেনে কোমপানির লোকেরা। তারপর খোসা ছাড়িয়ে

মাথা-বাদ চলে যায় টিনভর্তি হয়ে বিদেশে। তাই এতো দাম। আর তিতিরা কলকাতার বাজার থেকে সেই দাঁড়া মাথা কেনে। দাঁড়া

মাথায় শাঁস মাছ নেই। শীতকালে লাল-হলুদে মেশা ঘিলুও বিস্তর মেলে। মাছ চিংড়ির কথা আলোচনায় তিতির কোনো বিরক্তি ক্লান্তি নেই। খেতেও নেই। তবে, খুব একটা খেতে পারে না কতটা

আর খাওয়া যেতে পারে, বলো? পেটটা তো আর চার নম্বরী ফুটবল না।

তিতিদের নৌকো নিরুদ্দেশে ভাসছে। জল নৌকোর কানা ছুঁয়ে যাচ্ছে। খুব একটা বড়ো তো না? এই মাঝারি গোছের চেহারা। আর তিতি একটু ঝুঁকে পড়ে হাতে করে জল তুলে গঙ্গা গঙ্গা করে চতুর্দিক ছিটোচ্ছে। মাঝখানে একটা মন্দিরের মতো ছোট্ট চারকোনা ঘর। কিন্তু মোটেই মন্দির না। মূর্তিই নেই। এটা যেন জলে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নৌকো বেঁধে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যই তৈরি। কিংবা উঠে বসো। ফ্লাসকে চা-ফা থাকলে দু'দশ মিনিট বসে চা বিস্কুট খাও। চারদিক তাকিয়ে ছাখো। শীতে পাখির হৈ চৈ কিচির-মিচির শোনো। আর কী?

জলটুঙ্গিটা তিতির ভীষণ ভালো লাগলো। চৌখুপি ঘর। জলের ওপর ভাসছে যেন। কী ভাবে যে তৈরী করা হয়েছে কে জানে? এমন কতগুলোই বা আছে? মাঝি বলছিলো, রাজা এখন অনেকগুলো টুঙি তৈরী করে দিয়েছে। রাজা? কোন রাজা? কই তার নাম? কোথাকার রাজা ছিলেন তিনি। দূরে ঐ যে একটা সবুজ পাহাড়-অলা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে—ওর নাম নাকি নল বন। ওখানে রাজার তৈরী একটা মন্দির আছে। শিকার করার জন্যে একটা গম্বুজঅলা মিনার আছে। এখন শীতে পাখির বাসা ঐ জলদ্বীপ। এখনো তো তেমন জমপেশ করে শীত পড়েনি। পাখিরা সব এসে এখনো পেঁছয়নি তবু ওখানে যাবার জন্যে তিতির মনটা আঁকু পাঁকু করছে। কিন্তু দূর আছে। যেতেই ঘন্টা খানেকের বেশি। ফিরতেও ঐ রকম।

বাবাকে বলতে বাবা বললেন, একবছরের মতন দেখাটা তোলা থাক তিতি। আমিও দেখিনি। আবার একবার ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আসবো। বেশ কদিনের জন্যে। এসে থাকতে হবে বেশ কটা দিন। সেবার আর এতো ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করবো না। টিলকারানী হাউস বোটে উঠবো। সব কটা দ্বীপ ঘুরে-ফিরে দেখবো। সেবার

শুধুই চিল্‌কা। আসবে তো? নিশ্চয়। তিতির একটু মন খারাপ হলো। জলের নিচে নানা রকম মাছ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। যেন হাত বাড়ালেই ধরা দেবে। পিঠ উলটে গায়ের বুনোন দেখাচ্ছে।

আচ্ছা বাবা, সেই যে উড়ুক্কু মাছের কথা বলতে না, তা কি এখানে দেখা যাবে?

না রে, সে শুধুই সমুদ্রে দেখা যায়। তাও সর্বত্র নয়। তোর সুনীল কাকু বলেছিলো, আন্দামান যাবার সময় জাহাজ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ দেখেছে।

আমরাও তাহলে একবার আন্দামান যাবো, বাবা।

নিশ্চয়ই যাবো। গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে ওখানে। সে আমি ব্যবস্থা করবো।

খুব জলদি ব্যবস্থা করো কিন্তু বাবা। আমার এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে করছে। তিতির মা জলের দিকে চোখ নিচু করে কী যেন সব দেখছে। রোদ্দুর আড়াল করার জন্যে মাথায় কাপড়ের খুঁট তুলে দিয়েছে। ভারি সুন্দর লাগছে মাকে তিতির। মা যেন ঘোমটা দিয়েছে। ঘোমটা দিতে মাকে কচিৎ দেখেছে সে। দেখেছে কী? মনে পড়ছে না তেমন করে। তবে ঘোমটা-টানা ছবি দেখেছে মার অনেক। বাড়িতে ভাসুর-শ্বশুর বলতে কেউ নেই তো! তাই ঘোমটা দিতে হয় না। বড়ো বলতে তো বাবাই। ঠাকুমা আছেন অবশ্য। তবে, ঠাকুমা খুব সিম্‌পল্। অতো ঘোমটা-টোমটার ধার ঠাকুমা ধারে না। ঘোমটা টেনে কী আর কাজ কম্ম করা যায়?

ও সব আবার কী? এখন ওসব চলে না।

তবু কোন যুগের ঠাকুমা? তুমি তো বেশ মডার্ন দেখছি। তিতি সর্বদা ঠাকুমার পিছনে লেগে আছে। ঠাকুমা লেখাপড়া তেমন জানে না। তখন ওসবের চল ছিলো না তেমন। তাছাড়া ঠাকুমার তো বিয়েই হয়ে গেছে ১৩/১৪ বছর বয়সে। পড়াশুনো করবেটা কখন ছাই!

লেক থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হলো। প্রায় মাথার ওপর

সূর্য। চৌকিদারকে তিতির বাবা সকালেই বাজারে পাঠিয়েছিলো। এখন রেশন হাউসে ফেরার পথে, ওরাও বাজারের দিকে। সোজা পথ থেকে একটু বেঁকে, রম্ভার টুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে একেবারে বাজারের মুখে গিয়ে পড়লো ওরা। বাজার মানে তরিতরকারির প্রায় দেখা নেই, যা আছে তা হলো মাছ আর মাছ। চিংড়ি, কাঁকড়া, মহামাগুর। এতো বড়ো মাগুরমাছ তিতি কখনো দ্যাখেনি।

বাবা বললেন, বাজারে দেখি। কিন্তু, সমস্তই মরা। জল থেকে তোলার পর এরা বেশিক্ষণ বাঁচে না। এমনও হতে পারে, এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে পাত্রের দরকার তেমন পাত্র পাওয়া কঠিন। সাধারণ ছোট আর মাঝারি মাগুর তো বহুদিন বাঁচে। মাছ-অলাদের জিগ্যেস করতে হবে কলকাতায় ফিরে।

এই রম্ভা রাজ্য বাবা বলেছিলো, বহুকাল আগে নাকি মেয়েরাই শাসন করতো। মেয়ে-শাসিত রাজ্য! অর্থাৎ মেয়েরাই এখানকার সব। মাছের বাজারটা এক লহমা দেখে তিতির এই কথাটা মনে পড়ে গেলো। যারা মাছ বিক্রি করছে, তারা সবাই মেয়ে। আর কি সুন্দর মত দেখতে তাদের! টিকালো নাক। গায়ের রং আগুন পারা। কাটা কাটা চোখ মুখ। হুরী-পরীদের মতন অবিকল দেখতে। মুখে পান আর অবিশ্রান্ত হাসি।

আবার কিছু কাঁকড়া চিংড়ি কিনে গেস্ট হাউসে ফেরা।

এটা বাড়তি। মা শুধু গজগজ করছে, চৌকিদার সমস্ত ফেলে দেবে দেখো যা রাঁধবার অলরেডি রেঁধেছে তো, এতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়। প্রত্যেকেরই বিষম সর্দি। তার ওপর এই গাদাগাদা চিংড়ি মাছ। মানুষের লোভের একটা সীমা আছে, সত্যি।

বাবা বললেন, ট্রেন তো সেই সাড়ে চারটে পাঁচটায়। এগুলো এবেলার জন্যে নয়। রাতের ট্রেনের জন্যে। খুরদার গিয়ে তো ট্রেন বদল করতে হবে আবার। ওয়েটিং রুমে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওখানে একটা রেষ্টুরেন্টও আছে। কী দেবে, না দেবে। ভাত ডাল নিয়ে

এগুলো খেয়ে নিলে হবে। এ বেলার জন্যে তো যথেষ্টই মাছ-ফাছ এনেছে বলে মনে হচ্ছে। না কী রে তিতি—বল না?

তিতি তো বাপকে সাপোরট করেই আছে। বাপ-কা বেটি।

তা নয় তো কী? কেউ কি আর মা-কা বেটি বলে? ছড়ায় পড়োনি নাকি? 'বাপ-কা বেটি সিপাই কা ঘোড়া কুছ্ নেই তো থোড়া থোড়া'—বাবা তো সেই ঘোড়ার ব্যবস্থাই করেছে মা। রেষ্টুরেণ্টে কী পাওয়া যাবে না যাবে ভেবেই তো বাবা আগে থেকে প্রস্তুত।

চৌকিদার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিলো। আমরা বাজারে কৈ মাছ দেখিইনি। তা, দেখবো কী করে? সবগুলো মাছই যদি চৌকিদার তুলে এনে থাকে।

এখনো শীত তেমন পড়েনি। তবুও, কী তেল মাছগুলোয়! এবং সরু ছড়ির ডিম। ডিম এখনো ভালোভাবে পুরুস্ট হয়নি। চৌকিদার কৈ-তেল বানিয়েছে।

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলো, তেল-কৈ বলো। একটা জিনিষ খাচ্ছো, আর তার সত্যিকারের নামটা জানবে না? ঠিক নয়।

চৌকিদার সরপুঁটি পেয়েছে। চিংড়ির একটা মালাইকারি করেছে। আর সরষে শাক, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল। ডালের কোনো দরকারই ছিলো না, তিতি বলে উঠে।

তা ঠিকই। আমরা একটা পাত্রে রাতের জন্যে নিয়ে নেবো।

রাত্রের জন্যে আর কী কী নেবে? কিছুই বাদ রাখবে না, দেখছি। কাল ভোরেই পুরী পৌঁছুবো। মনে হচ্ছে তোমার খাবারের মেনু কাশ্মীর যাবার জন্যে তৈরি করছেন। তোমার সঙ্গে বেরুনো মানে, শুধু খাওয়া আর খাওয়া। হুঁঃ, তুমি নাকি আবার পদ্য লেখো। একটা জায়গা দেখে বলতেও শুনলাম না। জায়গাটা কী সুন্দর দেখেছো? যত্তো সব বানিয়ে-বানিয়ে 'সুন্দর লেখা'। সুন্দর তোমার এই খ্যাঁটন আর গড়ানো বুঝলে?

এসময় তিতির বাবার কোনো জবাব দেবার থাকে না। কীইবা জবাব হবে?

এর পর এগুনো পুরীর সুমুদ্দুরের দিকে। আগেও বহুবার গেছে তিতি। কিন্তু, পুরী যেন পুরনো হবার নয়। থেকেওছে নানান জায়গায়। হোটেলে ভাড়াবাড়িতে আর বিভিন্ন সংস্থার হলিডে হোমে থেকেছে ওরা বহুবারই। এবারে আগে থেকে কোনরকম ব্যবস্থা না করেই চলেছে। একটা না একটা মাথা গোঁজার জায়গা জুটেই যাবে।

ষ্টেশন থেকে নেমে রিকসায় উঠলো তিতিরা। এবারে তো রিকসাঅলাকে একটা কিছু বলতেই হয়। তিতির বাবা বললেন, চলো পান্থনিবাস চলো। আগে দেখা যাক ওখানে জায়গা পাওয়া যায় কিনা। না পেলে অন্যত্র হোটেল ফোটেল খোঁজা যাবে। শুনেছি পান্থনিবাসের ব্যবস্থা ভালো। , সরকারি ট্যুরিস্ট লজ তো? তাছাড়া হয়েছে তো এই সেদিন। নতুন বাড়ি। স্যাতসেঁতে কিছু হবে না। ভাড়াও রিজনেবল। রেস্টুরেন্ট এ্যাটাচড।

ষ্টেশন থেকে রিকসায় চেপে বসা মাত্রই একটা অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা পেয়ে বসে তিতির। এদিক ওদিক দুদিকের ঘরবাড়ি, বালুর পোড়াজমির মধ্যে দিয়ে রিকসা দৌড়ে চললো। উঁচু থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে যেমনটা হয়, ঠিক তেমনিভাবে গড়াতে গড়াতে রিকসা ক্রমাগত নামছে। সুমুদ্দুরের নীল এখনো দেখা যায়নি। তিতি চোখ টেনে বড়ো করে রেখেছে, কখন কোন ফাঁকে সমুদ্দুর নীল জিরাফের মতন গলা বাড়িয়ে দেয় কোথাও তিতি তাকে দেখবেই দেখবে। অন্য সবার চেয়ে আগে সমুদ্র দেখবে তিতি। এ এক ধরণের ইচ্ছে আর কী? ছোটদের ছোটমটো খেলাই এটা।

পুরীতে গিয়ে পৌঁছুলো সকলে। সুমুদ্দুরের ধারের দেশে শীত পড়তেই চায় না। তবু, গায়ে একটা পাতলা হাত কাটা

সোয়েটার লাগিয়ে দিয়েছে মা। রৌদ্র একটু একটু করে বাড়ছে। আর গায়ের ভেতরটা কুটকুট করে উঠছে। তবু, উপায় নেই। রিকসা গড়িয়ে নামছে। হাওয়া কেটে নামছে। তাই বুক বাঁচাতে সোয়েটার খোলা চলবে না। নেমেই খুলে ফেলবে—মনে মনে ঠিক করে রাখে তিতি। নামতে নামতে রোদ্দুর চড়চড়িয়ে উঠবে। আশা করি, তখন আর আপত্তি থাকবে না মায়ের দিক থেকে।

পান্থনিবাসটা দোতলা আর বেশ বড়োসড়ো। হলুদ রঙের নতুন বাড়ি। সামনে কোন আড়াল নেই। একদম ফাঁকা। বালুভরা মাঠ। মাঠের নিচেই সমুদ্রের নীল। ঢেউ সাদা হয়ে ভেঙে পড়ছে বালু-বীচে। ইতিমধ্যে জল ঘাঁটতে, চান করতে নেমে গেছে একদল। একদম দেরী করতে চায় না যেন কেউ। সকাল দুপুর বিকেলে ঝাঁপাই জোড়া। সমুদ্দুরের ধার ছেড়ে কেউ আর ঘরেই ঢুকতে চায় না। পান্থনিবাসের দোতালায় থাকার জায়গা পেলো তিতিরা। সামনে টানা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই সামনে সমুদ্দুর। কোন বাড়ীর আড়াল আবডাল নেই। তিতি ভাবে, বারান্দায় কোমর পর্যন্ত দেয়াল তোলার বদলে যদি জালি-কাটা রেলিং থাকতো, তাহলে কী সুন্দর বসে বসে সমুদ্র দেখা যেতো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হতো না।

এবারের পুরী যাওয়াটা হঠাৎ-পাওয়া। এবং খুবই তড়িঘড়ি। কেননা, কিছুদিন আগেই গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান ঘুরে এসেছি। ভায়া দিললি। তারপর, মোট দু-সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই ফিন দিললি। এটা বাবার হঠাৎ নেমতন্ন আসায়, হঠাৎ হয়ে গেলো। সে-গল্প পরে পশ্চাতে বলা যাবে।

এখন পুরী। পুরীর কথায় আসি আগে। তার আগে বাবার প্রস্তুতি নিয়ে দুটি-একটি কথা। বাবার বন্ধু সমীরবাবু আর মায়া মাসিরা কোথাও যেতে চায়। অনেক দিন যায়নি। আমরা তো একপায়ে খাড়া সদাসর্বদা, বিশেষ বাইরে যাবার কথায়। লোক অর্থাৎ চেনাজানা লোক আর পাড়া-পড়শিরা ঠারেঠোরে বলেই, তোদের পায়ের তলায় সরষে আছে। গড়াতে বললেই গড়িয়ে যাস। তোর বাবার কি বেড়ানোর চাকরি? আছিস ভালো।

এবার পুরীতে আমাদের তিন তিনটে ইউনিট। থার্ড ইউনিট ভারতী মাসী আশিস মেসোর। থাকার জায়গা অনেকগুলো হওয়ায়, তার থেকে বেছেবুছে একটাকেও শেষমেশ দাঁড় করাতে পারা গেলো না। এমনকি, লিষ্টিতে ভারত সেবাশ্রমের কথাও ছিলো! বাবার অপিসের বন্ধু, আমাদের কদিন আগে যাবে। উঠবে সেবাশ্রম অতিথিশালায়। বাবা তাকেও বলে রেখেছে, প্রথমে ওখানে যাওয়া হবে। তারপর কী রকম কী দেখে-শুনে বাসাবদল।

মা বাবার যেমন বন্ধুরা যাচ্ছে, আমার বন্ধু যাচ্ছে কুসমি আর তাতারের বন্ধু যাচ্ছে শুভ—ভারতী মাসিদের ছেলে। ট্রেনের টিকিট এবার আর বাবার ওপরে নেই। সমীরকাকুই কোন্ এক ট্রাভেল এজেনটের মাধ্যমে কেটে ফেলবে, কথা আছে। কথামতোই কাজ। চলছি জগন্নাথ একসপ্রেসে। সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার। মায়া মাসিরাও রাতের খাবার নিয়েছে। সকালের নমো নমো খাবারের পাট সেরে একটু বিশ্রাম। বাবা আপিস থেকে ফিরলে বিকালের ট্রেন ধরা। ঘুম কি আর হয়? মাঝে মধ্যে খাট থেকে

জিরাফ- গলায় রাস্তার দিকে চোখ। দেরি করছে কেন। বিছানাপত্তর বাঁধা শেষ। বাক্সপেঁটরা গোছানো সারা। বাকি শুধু ট্যাক্সি। ট্যাক্সি ভোঁ-দৌড়। সোজা হাওড়া ইস্টিশন। প্ল্যাটফর্ম। গাড়ি পুরী।

সত্যিই শেষমেশ গিয়ে ভারত সেবাশ্রমে উঠতে হলো স্বর্গদ্বারের কাছে। গেট থেকে বেরুলেই দোকান পাট! সর্বদা রমরম ঝম ঝম করছে ভিড়। রিক্সা গাড়ি জ্যামজমাট। একটা মেলা-মেলা ভাব সর্বত্র। ভালোর মধ্যে ভালো—দু-পা গেলেই সমুদ্র। থাকার জায়গাটা মনে ধরেনি একেবারেই। ধর্মশালা আসলে। কিন্তু এতোদিন ধরে এতো জায়গা ঘুরেছি, কক্ষনো ধর্মশালায় উঠিনি। বাবাও জানতো না, ধর্মশালা ব্যাপারটা কী? সেজন্যে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল—এই হোটেল ঐ হোটেল। স্রেফ্ মাথা গোঁজার একটা ভদ্র মতন জায়গা পেলেই হবে। কিন্তু সর্বত্র ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই। পুণ্য করতে এসে তবেই ধর্মশালা। আর আমরা তো বেড়াতে এসেছি। আমাদের সামান্য আরাম তো দরকার। তোমরাই বলো?

শেষ পর্যন্ত সাগরিকা হোটেলে জায়গা মিললো। দুদিন পর। সেই দুটো দিন যে কীভাবে গেছে? মনে পড়লে, এখনো বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে ওঠে। বাবা আর সমীরকাকু মাকুর মতন পুরীর এদিক আর ওদিক করছে। মা মাসিদের মুখ গোমড়া। এ-হোটেল সে-হোটেলে খেয়ে বেড়াচ্ছি। সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছি ভয়ে ভয়ে। সুস্থির হয়ে একটু বসতে না পারলে জলে ঝাঁপাই জুড়ি কী করে? ঐ নিয়মমাফিক চান-পর্ব চলছে। বাবার সঙ্গে কথাই ছিলো—সকালে দুঘণ্টা আর বিকালে একঘণ্টা স্নান-সাঁতার হবে। সেই গোপালপুরের মতন। কিন্তু, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি। কী কষ্ট, না? এমনটা যেন কারো ভাগ্যে না হয়!

অথচ আমি বয়ে নিয়ে গেছি দু দুটো ট্রাঙ্ক, টুপি। চুটিয়ে স্নান

করবো—এই আশায়। এ্যানডারশনে তো মাত্র ৪০ মিনিট সাঁতার —নিয়মই করে। সমুদ্রের নিয়মই আলাদা। সেই সমুদ্রই সামনে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, আমার মতন তার চিবুক বেয়ে জল পড়ছে। সমুদ্রও কাঁদছে আমার দুঃখে। সমুদ্র কাঁদে। যে দেখার সেই শুধু দেখতে পায়। অন্যে পায় না।

সমুদ্রের ভগবান শেষমেশ আমাদের; মানে আমার আর কুশমিদির দুঃখে মুখ তুলে চাইলেন। সাগরিকায় গিয়ে উঠলুম। প্রথমত নীচের তলার একটা ঘরে। সেখান থেকে দোতলায় পরদিন। খাবারের জন্যে আর বাইরে যেতে হয় না। বারান্দায় বসে বসেই সমুদ্র দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে মনে হয়, সমুদ্রের জল বুঝি ঘরের মধ্যেই হুটোপাটি করে খেলে বেড়াচ্ছে তাতারের সঙ্গে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠি। সব খেলা তাতার খেলে নিচ্ছে, এই ভেবে। কিন্তু, না—ঐ তাতার ঘুমোচ্ছে মার কোলের কাছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠে, বারান্দায় বাবার পাশে গিয়ে বসি। বাবা টেরও পায় না। কী যে খুঁজে বেড়ায় বাবা। চোখ সমুদ্রের দিকে।

শুধোই, ঘুমোতে যাবে না?

তুই কেন উঠে এলি? ঘুম আসছে না?

আসছে আর যাচ্ছে। এইমাত্র ভাঙলো।

তাহলে বোস। ছাখ, ঢেউয়ের মাথায় কী যেন জ্বলজ্বল করছে—দেখছিস? ওর নাম ফসফরাস—মানে—

আবার জ্ঞান দিতে শুরু করলে তো? তাহলে ঘুমোতে যাই বাপু…………

ভারতের সীমান্ত চামুরচি। সেখানে চা বাগান আছে। ইস্কুল-পাঠশালা আছে। চামুরচিতে দোকানপাটও অজস্র। আমরা
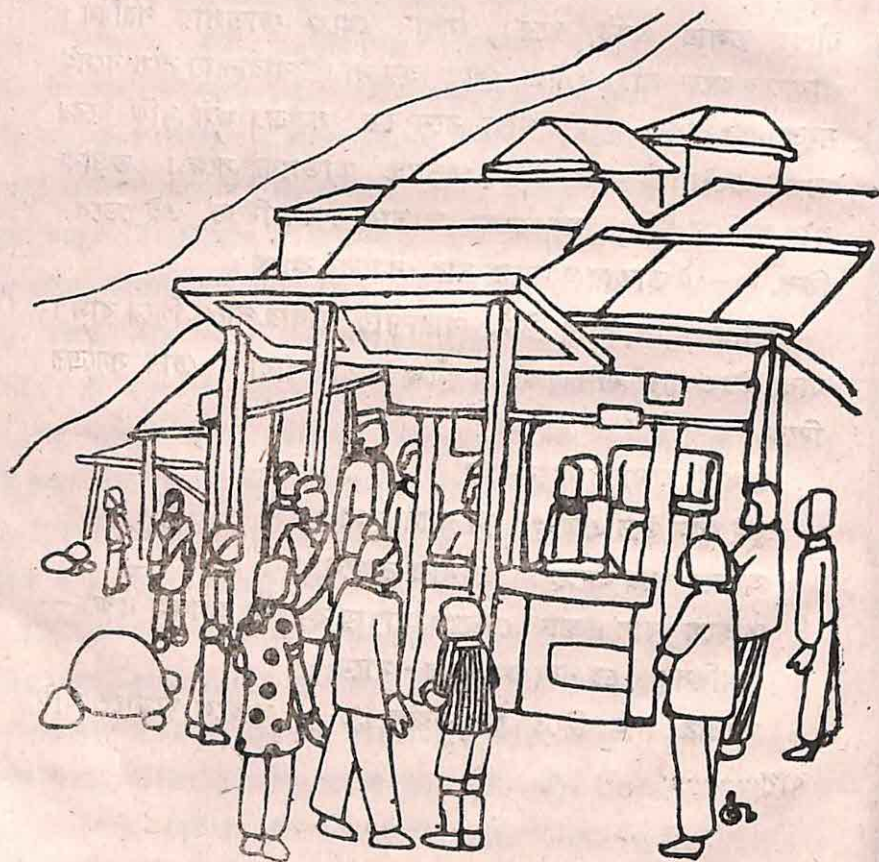
যে-জিপটায় চড়ে এসেছিলাম, সেটাকে চামুরচি হাটের মাঝখানে ছেড়ে দিলাম।

সামচিতে হুদিন

পাহাড়ি শহর সামচি থেকে আরেকটা গাড়ি নেমে আসার কথা। ভূটান সরকারের গাড়ি। ঝকঝকে বিদেশী ল্যাণ্ড-রোভার একটা ঐতো হাটের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে। পিত্তি-রঙা গাড়ি।

বাবা আমাদের পুরনো জিপে বসতে বলে ঐ পিত্তি-রঙা গাড়িটার দিকে গেলো।

জলপাইগুড়ি থেকে একটানা আসছি। মা-র কোমর ধরে গেছে বলে, নিচে নেমে দাঁড়াল। আমিও নিচে। তাতার ড্রাইভারের গা ঘেঁষে বসে আছে তো বসেই আছে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ। তবু, তাতারের যা কাজ, এটা টানছে ওটা টানছে এটা ঠেলছে ওটা ঠেলছে। এই ঘণ্টা হুয়েকের জার্নিতে তাতার বোধহয় ড্রাইভিংটাই শিখে নিল! পাঁচ বছরের প্যাংলা, তার ঠাটঠমক পঁচিশ বছরের মদ্দর মতো! রিয়েল পাকু।

চামুরচি বাজার ভর্তি কমলালেবু। চারকোনা টুকরি ভরা ভুটিয়া মেয়েরা লাল-হলুদে টকটকে কমলা এনে পাহাড় করছে এখানে ওখানে। বাগান থেকে সোজা হাটে নামছে মেয়েরা পাকদণ্ডী বেয়ে। মেয়েদের গালগুলোও কমলার মতো রাঙা, ফাটোফটো। জুতো মোজা একসাথে বানানো। মোজাগুলো দেখতে খেলোয়াড়দের হোসের মতন। গায়ে মোটা পশমের জোব্বা। রুপোর গায়ে নানারঙ পাথর-বসানো গয়নায় গলা ভর্তি। কানজোড়া কানপাশা। নাকে নোলক। বুড়িদের হাতে-পায়ে উলকি। মুখে তাদের হাসি আর হল্লা। এরা যেন কাঁদতেই জানে না। ভুটিয়া পুরুষরাও আছে ইতস্তত। সমতল থেকে ফড়েরা এসেছে কমলা কিনতে। দর-দাম মেয়েরাই করছে। ছেলেরা বুড়োরা ইতস্তত বসে জটলা করছে রোদ্দুরে। রোদ্দুরে বেশ ঝাঁজ। বেলা দশটা-এগারটা হবে।

গয়েরকাটা ছাড়িয়ে বানারহাট পৌঁছতেই চোখে পড়েছিলো নীলচে কালো পাহাড়ের রেখা। পুব-পশ্চিম পুরো আকাশ জুড়ে এই ভূটান পাহাড়। ওদিকে চোখ পড়লেই মনে হচ্ছিলো বৃষ্টি হচ্ছে

ঐ সমস্ত পাহাড়ে। মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে কাশফুলের মতো—এদিক ওদিক। তারপর চামুরচি এসে আরো স্পষ্ট হলো। মেঘগুলো ভেড়ার পালের মতো খেলা করে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশ জুড়ে।

ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। আমরা চামুরচি পার হয়ে নো-ম্যানস-ল্যানডের শটিখেতের মধ্যে দিয়ে গুড়গুড়িয়ে এগুচ্ছি। বাবা বললেন, দু দেশের দুই সীমান্তের মাঝখানে এরকম খানিকটা করে জমি পড়ে থাকে। এটা কোন দেশের সম্পত্তি নয়। ডলোমাইটের সাদা পাথরগুলো মুখে-চোখে এসে জমে যাচ্ছে ভিজে হাওয়ায়। রুমাল দিয়ে মুছলেও যাচ্ছে না। এ থেকে সাদা সিমেণ্ট হয়। ডলোমাইট খনি সামচিতে পয়সা আনে। যেতে যেতে দুবার আমাদের গাড়ি থামলো চেকপোস্টে। গাড়ির নম্বর টুকে রাখলো ওরা। সেই সঙ্গে আমাদের নাম-ঠিকানা।

সমতলে কিছুটা পথ। পাহাড় এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। গাছপালার সবুজের মধ্যে লাল টালিঘোলা এখানে-ওখানে উঁচু-নিচু। কখনো গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুঁয়ে মতো রঙিন গাড়ি। কোনটি নামছে, কোনটি উঠছে। আমরা পাহাড়ি পথের মুখে এসে হাজির। ঠাণ্ডা বাড়ছে। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ এক পশলা করে বৃষ্টি নেমে গেছে গাড়ির ওপর। মাঠের চতুর্দিকে। এখানে ওখানে জমা জল। সিঁড়ি কাটা ক্ষেত-খামার। বাবা বললো, এই ধাপ-চাষের নাম 'জুম'। আগে দেখেছো?

বললুম, বারে, দেখবো না কেন? পাহাড়ে তো এইরকম চাষই হয়। শুধু 'জুম' কথাটা মনে ছিলো না। এইসব জমিতে জোয়ার আর ভুট্টার চাষই হয়। কিছু কিছু মোটা ধানও হয়ে থাকে।

শীত বাড়ছে। হাওয়া আরো দামাল হচ্ছে। জল বেশি। মুখ চোখ ভিজে যাচ্ছে। গাড়ির সামনের কাচ পরিষ্কার করছে ওয়াইপার। মেঘের ভেতর দিয়ে পথ কেটে এগুচ্ছি। কালো পীচপথ একেবেঁকে ক্রমাগত উপরে উঠছে। দুপাশে ঘন পাইন।

কখনো একদিকে কাটাপাহাড়, অন্যদিকে খাদ। কখনো তার উলটো। ডাইনেরটা বাঁয়ে যাচ্ছে। বাঁয়েরটা ডাইনে। একভাবে ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে চলেছি আমরা।

যতো উঠছি বাড়িঘরের ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে গাছপালার ভিড়। গাছ মানে ঐ পাইনই। পাইন আর উইলো। উইলো-পাইন এই দু'ধরনের গাছের মধ্যে দিয়ে শন শন হাওয়া কান্নার মতন কানে আসে। অতর্কিত রাতে মনে হবে কোনও বাচ্চা ছেলে এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। এখানে তো আর শকুন নেই! নইলে এই একটানা কাতরানি শকুনের কান্নার মতো মনে হতো তিতির। তিতি জানে, শকুন কীভাবে কাঁদে। কেমন করে কাঁদে। ইনিয়ে বিনিয়ে সে-কান্না শুনে তিতি কষ্ট পায়। কষ্ট তার এখনো হচ্ছে। শীতের কষ্টও বড় কম নয়। শীত কামড়ে বসছে নাকে চোখে মুখের খোলা জায়গাগুলোতে। তাতারের অবস্থা তো আর কহতব্য নয়। মা-র একটা গরম শাল আপাদমস্তক মুড়ে ছোটখাট বস্তা বা পুঁটলির ভেতর ঘুমুচ্ছে সে। এমনিতে তো বাঁধাকপি? গরম জামা গেঞ্জি কোটে—বলো তো, বাঁধাকপি ছাড়া ওকে আর কী বলা যায়? অবশ্য এই শীতে জামা কাপড় ছাড়ার কোনো কথাই ওঠে না। চান-ফানতো শিকেয় উঠল এ-কদিন। তবে, হাত মুখ ধুতে হবে তো! নাহলে মা টেবিলে বসতেই দেবে না।

মিনিট বিশেক হলো! ওপরের দিকে উঠছি তো উঠছিই। গাড়ি হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে একটা টেবিল পাহাড়ে এসে দাঁড়াল। চারদিকে বাঁধানো পাকা দোকানের ধারে। মাঝখানে একটা লম্বাটে টিনশেড। সেখানে আবার চামুরচির মতনই এক কমলাবাজার।

ড্রাইভার জানাল, বাজার সবে বসল। বিকালের দিকে এলে বাজারের আসল চেহারা মালুম হবে। কতরকম সওদা আসবে। চমরীগাই-এর দুধ থেকে চকোলেট। ঘি, ভুটিয়া, জুতো, জোব্‌বা—কতো কী। প্রধান সওদা হচ্ছে কমলা।

বেশ কিছুক্ষণ সামচিবাজারে আমাদের গাড়ি থেমে রইলো। বাবা একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে চা কফি বিস্কুট চীজ আরো কী কী সব সওদা করলেন। চললো গাড়ি। সরু সাপের হিলহিলে পথ বেয়ে গাড়ি ক্রমাগত উপরে উঠছে।

সামচির যে অঞ্চলে আমরা থাকবো সেখানটা ঠিক সিঁড়িভাঙা অঙ্কের চেহারার একটা চষা জমি। থাকে-থাকে ওপরে থেকে নিচে নেমে এসেছে। বৃষ্টি হলে জল হুড়মুড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। বৃষ্টি দেখেছিলুম বলেই বললুম এ-কথাটা। একটি চিঠিতে তিতি এ-সমস্ত জানিয়েছে বুম্বাকে, তার পাতিপুকুরের ঠিকানায়।

সামচির এই কালোনি জিওলজিক্যাল সারভের দখলে। অর্থাৎ ভারতের সারভে অফিস ভূটান সরকারের হয়ে এই প্রতিবেশী রাজ্যে মূল্যবান সব খনিজ পদার্থ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু ইতিমধ্যে পেয়েওছে। বহু পেতে বাকি। তাঁদের ধারণা, ভূটানে যে-খনিজ দ্রব্য লুকানো আছে, তার যদি খোঁজ পাওয়া যায় এবং তা কাজে লাগানো যায়—ভূটান তাহলে অন্যতম ধনী রাষ্ট্রের সারিতে এসে দাঁড়াবে একদিন। আর সে-ব্যাপারে সাহায্যের হাত, বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত!

কলোনির নতুন সমস্ত ঘরবাড়িগুলো আট-নটি সারে সাজান। পর পর বাংলো ধরনের বাড়ি। একতলা। ওপরে টিনের চাল। বাড়িগুলো খুবই হালকা মালমশলা দিয়ে তৈরি। কেন? না, এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। জানা গেল।

আমরা যে-বাড়িতে আছি, সেটি সেই ঢালু হয়ে আসা অঞ্চলটার মটকায়। এবং তার পিছনেই বিপুল খাদ। খাদে যে-নদী থাকার কথা, তার নাম ডায়না। এখন জল নেই, মানে, নদীই নেই। ডায়নার খাদের পরেই ভূটান পাহাড় শুরু। সেই যে শুরু তার শেষ কোথায় জানতে গরমকালে কেউ কেউ পাহাড় চড়তে যায়।

আমরা যাঁর কাছে উঠেছি সেই দেবুজেঠু এই সারভে অফিসের

একজন বড়কর্তা। বাবার বন্ধু। একা থাকেন। তাঁর মুহুর্মুহু নেমন্তন্নে বাবা এবার সাড়া দিয়েছেন।

ডায়না থেকে হুহু করে হাওয়া আসে, দস্যু-ডাকাত হাওয়া, আর আমরা হিমে জমে যেতে থাকি। রগড় মন্দ নয়। শুধু লেপের ভেতরে গলা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে থাকা, জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

অমন হুহু হাওয়া আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। ডায়নার জলহীন কোল জুড়ে নুড়িপাথরদের সঙ্গে খেলা করতে করতে কখন সেই হুহু গিয়ে আমাদের খোলা দরজা জানলা পার হয়ে গড়াতে-গড়াতে নিচের দিকে নামতে থাকে, বারান্দায় বসে স্পষ্ট যেন দেখা যায়। এমন মেহেরবানী হাওয়ার কথা কেউ কখনো বাপের জন্মে শোনে নি !

আর বাড়িঘরগুলোরই বা কী চেহারা ! খেলনাবাড়ির হাবে-ভাবে পর পর সাজানো। থাকে থাকে, ওপর-নিচ—তা আগেই বলেছি। বড় কালো পাথরের ওপর বর্ষার জলপ্রপাত, যেমন হিরনিতে দেখেছিলাম, তেমনি মাথা ছাপিয়ে সুতোর মতো অজস্রধারে নামে এই আমাদের সামচির সরু কালো সুন্দর পথগুলি—সবুজ ভেদ করে ক্রমাগত নিচের দিকে, ক্রমাগতই নিচের দিকে। তারপর নদীর মতো আসল সড়কে পড়া। আর সড়ক পাক দিয়ে-দিয়ে সামচির বাইরে।

আমরা তো দু'চারদিন থাকবো বলে এসেছি। প্রথম দিনটা তাই শুয়ে-বসেই কাটবে বলে মনে হচ্ছে। তবে বাবা মা দেবুজেঠুর সঙ্গে সামনের লনে বেতের চেয়ারে বসে যতই গল্প করুক, আমি পুঁচকে তাতারের হাত ধরে এদিক-ওদিক যাবোই। একটা কথা অবিশ্যি, মা-বাবার চোখে-চোখে থাকলে ওঁদের কারো আপত্তি নেই। আমি একটু নিচে নামবো, দৌড়ে ওপরে উঠবো। তবে, পথ দিয়ে।

পরিষ্কার রাস্তা না হলে কোথায় কী কাঁটা-ফাঁটা থাকে, পায়ে বিঁধে যায়, রক্ত পড়ে আর বকুনি ঝরে।

যেমন হাওয়া, তেমন মেঘ। সর্বদাই শীত জুজু হয়ে এখানে সর্বত্র বসে। মেঘগুলো মাথার ওপর দিয়ে শুধুই ঘুরে বেড়ায়। কাজ নেই কর্ম নেই হুটহাট করে একপশলা জল ঝরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। একপাল ধোঁয়া ধোঁয়া চমরী গাই যেন আকাশটাকে তৃণভূমি বানিয়ে দিনরাত্রি চরে বেড়াচ্ছে। অফুরন্ত, উধাও তৃণভূমি, অজস্র অগুণতি চমরী। এখানকার কুকুরগুলোর গায়েও ঝুপসি লোম। ছাগল ভেড়ার তো কথাই নেই। লোমে লোমে চোখ পর্যন্ত ঢাকা। দেখা-শোনা চলে কী করে বুঝতে পারি না। ব্যাপারটাই যেন একটা মেঘমুলুকে ঝাপসাভাবে চলে আসার মতন।

এটুকু জীবনে তো কতো জায়গাতেই ঘুরলাম, এমন অবাক-করা দেশ কিন্তু কোথাও দেখিনি। সব থেকে মজার ব্যাপার একটা তোমাদের বলি। পরদিন, তখন আর কটা হবে? এই সকাল সাড়ে নটা দশটার বেশি নয়। আকাশটা মুখ গোমড়া করেই ছিলো সকাল থেকে। মোটা লেপ এক চিলতে সরিয়ে জানালা দিয়ে ব্যাপারটি দেখে আবার ডুব। উঠতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুচকুচে কালো আর কেমন যেন ঘোরালো হয়ে উঠলো বাড়ির বাইরেটা। কিছু বুঝে উঠতে না-উঠতেই গুড়গুড়িয়ে উঠল বাইরের দিক। ঐ দিনের বেলাতেই আকাশ কেটে-ছিঁড়ে তছনছ করতে লাগলো বিদ্যুৎ। থরথরিয়ে উঠতে লাগলো ঘরবাড়ি।

দেবুজেঠু ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে বললেন, চলো ঘর ছেড়ে সবাই মিলে, কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়াই। মা বাবা দুজনেই ওঁর দিকে এক লহমা তাকিয়ে কী যেন বুঝলেন।

বুঝে বললেন, তাতারের গায়ে তো গরম কোট আছেই। মাথার টুপিটা পরিয়ে দাও। আর তিতি, তুমি লেপ ছেড়ে এই কম্বলটা দিয়ে মাথা গা পুরোটা র‍্যাপ করে নাও। হুম করে ঠাণ্ডা না লাগে।

চলো একটা নতুন জিনিস দেখি। কোনদিন তো আর দেখা হয়নি। চলো, চটপট করো।

এত তাড়া কিসের বুঝতে পারছি না। দেবুজেঠু আর বাবার তো আপাদমস্তক মোড়া লংকোট। মাথায় বাঁদুরে টুপি। মা-র শীত এমনিতেই কম। কিন্তু, আমাদের ?

দেবুজেঠু দরজার দিকে ততক্ষণে। বাবা, তাতারকে কোলে তুলে নিয়েছে। আমি খুঁজে পাচ্ছি না জুতো জোড়া। এমনিতে পায়ে মোজা আছে। মোজা পরেই শোয়ার নিয়ম। যাই হোক, ঐ মোজা পরেই বারান্দা থেকে লনে। বৃষ্টি হয়নি বলে লনের মাটি ঘাস শুকনো। দেখলাম, শুধু আমরাই না, বাড়ি ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ ঠায় ঐ বরফে ঠাণ্ডার মধ্যে। মাথার ওপর হুড়মুড় চলছে তো চলছেই।

মজা ? তা লাগছিলো। তবে কী যেন একটা ভয়ে বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠছিলো থেকে থেকে। মা বাবা বিশেষ করে দেবুজেঠু যাতে না টের পায়, আমি প্রাণপণে শব্দটা থামাবার চেষ্টা করছিলাম। অন্যমনস্ক হয়ে থাকছিলাম। আকাশের দিকে, মেঘের গুমগুমের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কী চিক্কুর দিচ্ছে। চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামলো।

হঠাৎই বুককাঁপানো বাঁশি, যার নাম সাইরেন উঠলো বেজে। দেবুজেঠু এক পা এগিয়ে বলে উঠলেন, এবার চলো বারান্দায় উঠি। মনে হচ্ছে তিতি তাতারের জন্যে আরো একটা বড় ধরনের মজা অপেক্ষা করে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে।

আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলো টেনে বসেছি, দেবুজেঠু শুরু করলেন, এইমাত্র সামচিতে একটুক্ষণের জন্যে মৃদু ভূকম্পন হয়ে গেলো। তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে তিতি ?

মাথা নাড়লাম। তবে মাথা কেমন ঘুরছিলো একটু একটু।

তা তো ঘুরবেই। তবে আমাদের এই বাড়িগুলো এমন হালকা

করে তৈরি যে, সামান্য ভূমিকম্পে কোনও ক্ষতি হবে না। ভারি বা দোতলা তিনতলা বাড়ি হলে, ক্ষতি হতে পারতো। তবু বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সবাই। একটা অভ্যাসও বলতে পারো এটাকে। তবে সাবধানের মার নেই। ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়তে থাকলো যেন। মনে হলো, টিনের চালাটাই বুঝি ফেটে যাবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেবুজেঠু ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বললেন, বলেছিলুম না তিতি, এক্ষুনি আরেকটা মজা দেখবে। ছাখো ছাখো, সামনে তাকিয়ে ছাখো। আশ্চর্য! দেখলাম কী জানো? আধলা ইঁট আর রেলের ডুমো ডুমো খোয়ার মতন বরফ পড়েছে। ঐ আমরা যাকে 'শিল পড়া' বলি, সেই শিল পড়ছে চড়বড়িয়ে। একটু-ক্ষণের মধ্যেই গোটা লনটা সাদা বরফে ঢেকে গেলো। হুচার টুকরো যা ছিটকে বারান্দায় আসছিলো, তা কুড়োতে আমি আর তাতার এগিয়ে গেলে দেবুজেঠু বললেন, হাতে রাখো। মুখে দিও না। ওগুলোর মধ্যে ময়লা খুব বেশি। বসে বসে ছাখো না।

আশ্চর্য, এই কথাবর্তার ফাঁকে একসময় হঠাৎ দেখি রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে। সেই রোদ্দুর মেঘের ফাঁক খুঁজে নেমেও এসেছে, ঢালাও বরফের চাদরের ওপর। সে যে কী সুন্দর ঝকমকে স্বর্গ—না দেখলে বিশ্বাস করবে না। আর ওপরেঐ মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে গলে পড়ার সময়, মেঘ যেন শাড়ি, তার পাড় জ্বালিয়ে রোদ্দুর পড়ছে বরফে। স্বর্গ, ওপরে কি নিচে—বোঝা যাচ্ছে না।

মনে মনে ভেবে নিয়েছি, বাবাকে বলবো, হুদিনের বদলে দশ দিন থাকলেই তো ভালো। জেঠুও তো বলছিলেন, এক্ষুনি কি যাবে? আরো হু, দশদিন থাকো। আমি বদলি হলে এখানে এসে থাকবে কোথায়? এখানে তো আর হোটেল-ফোটেল নেই! সুতরাং, বাবাকে বলতেই হবে, কেঁদে-কেটে রাজী করাতেই হবে, কী বলো?

তিতি আর খৈরী

গিয়েছিলুম বালেশ্বর। সেখান থেকে চাঁদিপুর-অন-সী। দূর বেশি না। এই মাইল সাত আট। বালেশ্বর থেকে কালো ধরনের পীচ ঢালা পথ। নিচের দিকে চলেছে। বুঝতে মোটেই অসুবিধে হলো না যে, আমরা সুমুদ্দুরের দিকে চলেছি। চলেছি জিপে। বাবার বন্ধু বালেশ্বরের কালেকৃটর। জিপটি তাঁরই দেওয়া। সঙ্গে তিনি নেই। তবে, তাঁর ফরমান আছে। আমরা যখন যেদিকে যেতে চাই, জিপটি সেখানে সেখানে আমাদের নিয়ে যাবে! থাকা-টাকার বন্দোবস্ত সবই তিনি আগে থেকে করে রেখেছেন। সুতরাং, আমাদের হেডেক নেই। বহুৎ খুউব। আমি এ-ধরনের ব্যবস্থায় খুবই অভ্যস্ত। চাঁদিপুরে গিয়েছি বারকতক। কখনো ময়ূরভঞ্জ রাজার পুরানো কুঠি, এখন সরকারের ক্যাসুরিনা লজে। কখনো পর্যটকনিবাসে। এবার পূর্তবাংলোয় ঠাঁই হয়েছে। গাড়ি-ঘরও আছে। সুতরাং, জিপটি আমাদের সঙ্গে কাল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। আমরা চিবাবো মুরগির ঠ্যাং। আর ও গিলবে ডিজেল তেল। শক্ত জিনিস ওর আবার মোটেই রোচে না।

আমার সঙ্গে বাবা মা আর ছোট তাতার। জিপ গোঁ গোঁ করে টিলার মাথায়। বাংলো সেখানেই। সামনে ইট-বাঁধানো ঢালু জমি। দু'পাশে ফুলের গাছপালা। কাঞ্চন, এ্যালামনডা, করবী, কাপাসতুলো, কাজুবাদাম আর ঝাউ। বাংলোটা সুমুদ্দুরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। বারান্দা ভর্তি টব। টবের পেছনে কাৎ-করা চেয়ারের সারি। সুমুদ্দুর নয়। অবশ্য, ওখানে বসে দেখার উপায়ও নেই। যেমন আছে ক্যাসুরিনায়। যেমন খানিকটা আছে ঐ পর্যটকনিবাসে। ক্যাসুরিনায় আবার বেশি-বেশি! সে যে সুমুদ্দুরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আদিখ্যেতা, আর কি! রাজার ব্যাপার

তো ? সব্বার আগে তিনি সুমুদ্দুর দেখবেন কিংবা সুমুদ্দুরই তাঁকে আগে-ভাগে দেখবে।

তবে একটা সাফ কথা বাপু তোমাদের বলছি কানে-কানেই যে, চাঁদিপুর আমার ভাল্লাগেনি। কেন ? না, সেখানে চান-ফানের ব্যাপার নেই, সে আবার কোন্ প্যাটার্নের সুমুদ্দুর হলো ? তাছাড়া, ভীষণ নির্জন জায়গাটা। ভুতুড়ে-কছমের। জনমনিষ্যি নেই ! একটা সুমুদ্দুরের ধার বলে কথা—সেখানে এ কীরে বাবা ? মাঝে মধ্যে হুম হুম আওয়াজ। কীসের ? না, গুলি টেস্ট হচ্ছে। কোন্ গুলিটা কতদূর যায়—এই পরীক্ষা। তা, পরীক্ষার আর জায়গা পেলো না ? যা না, সুন্দরবনে, যা না। বাঘ তাড়া না ! খামোকা এখানে কেন পটাং পটাং শব্দ ! মরুক গে, এই রাতটা যাহোক করে কাটলেই বারিপদা। সেখান থেকে সোজা খৈরী দেখতে।

কে খৈরী ? তা, নিশ্চয় এতোদিন তোমাদের জানতে কারুর বাকি নেই ? আমরা খৈরী দেখতে চলেছি। বাবার ইচ্ছে ওর ওপর বই লেখা ! কী যে ছাইপাঁশের ওপর বাবার লেখার ইচ্ছে হয় মাঝে মধ্যে। মানুষে লেখে ? তাছাড়া, একটা বাঘের ওপর ? ছিঃ ছিঃ। বাবার যেন ভীমরতি ধরেছে ! লেখ্না বাপু সুনীলকাকুর মতন কাশ্মীর নিয়ে, কণিষ্কের ভাঙা মুণ্ডু নিয়ে। তা নয়, যতো সব উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপার। আমার ইচ্ছে, একটুখানি দূর থেকে দেখবো, চলে আসবো। এসে, তোমাদের কাছে হেঁক্কোড় নেবো। জানো, আমি খৈরীকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেলুম। সে-ও এগিয়ে এলো। এসে—যেন সেই এ্যানড্রোক্লেশ আর কাটকোঠা সিংহের গল্প। তা নয়, তিনি ওখানে নাকি দু' চারদিন থাকবেন। ঘোগ নাকি ? বাঘের ঘরে কে থাকতে যাবে ? শুনেছি, দুজন থাকে ওখানে। পিঠোপিঠি, গায়ে-গায়ে লেপটে থাকে। কে যেন বলছিলো, জানিস ওরা কে ? ওরা হলো গিয়ে পি. সি. সরকারের পিসেমশাই আর তাঁদের নিকট আত্মীয়া ! ওরা ছাড়া বাঘ বশ করবে কে ? দেখা যাক, শেষে কী

হয়। চলো বারিপদা। বারিপদাটা কী, জানো তো? ওড়িশার এক সেরা জেলা ময়ূরভঞ্জের সদর। হাকিম হুকুম কোর্ট-কাছারি সবই সেখানে। বাবা বহুবারই মিটিং-ফিটিং-এ গেছেন। আমরা এই প্রথম।

এখানেও আগে থেকে ব্যবস্থা। উঠলুম গিয়ে সারকিট হাউসে। বিশাল দোতলা বাড়ি। বিশাল বিশাল ঘর-বারান্দা। খাওয়া সেখানেই। একটা মুশকিলে পড়লুম। বালেশ্বরের সেই জিপ গাড়িটা রাস্তায় বেশ বেগোড়বাঁই করছিলো। যাহোক করে ঠেলেঠুলে এখানে পৌঁছে গেছে। ফলে, গাড়ি বদল করতেই হবে। আমাদের চান-ফান করে তৈরি থাকতে বলে বাবা বেরিয়ে পড়লেন। বেরুনোর আগে, কোথায় কোথায় যেন ফোনাফুনিও করলেন দু চারটে। বুঝলুম না? বোঝার চেষ্টাও ছিলো না অবশ্য। আপাতত বিছানায় গড়াতে থাকলুম। ধকল তো আর কম যায় নি? জিপে আবার একটু একশট্রা ধকল হয়। মা তো কোমর ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে একেবারে চক্ষু মুদে। শুদ্দু তাতার—তিনি একলাই বারান্দা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন! তা, বেড়ান। দুটি অন্ন পেটে গেলেই কুপোকাৎ। কিন্তু, আমাকে তো তা করলে চলবে না? কতো দেখতে হবে, কতো শুনতে হবে। শহরে ফিরে বলতেই বা হবে কতো! ওর তো আর ইস্কুল-পাঠশালের বালাই নেই। তাছাড়া, ও দুটো তিনটে শব্দ ছাড়া কিছু পছন্দ করে না। কিছু বলো, হয় হাসবে, নয় কাঁদবে। ব্যস! বেশ আছে। আমরা খেয়ে-দেয়ে রেডি। বাবাও ও-পাট চুকিয়ে বারান্দায় রেলিং-এ ঝুঁকে। গাড়ি আসবে। খৈরীর খোদ মালিক-মালকানের গাড়ি! আমরা ওঁদের সঙ্গে সোজা জশীপুর। খৈরী এখন ওখানেই। সদর দফতরে। রাজ্যপাট জেলা মহকুমা তাঁর শিমলিপাল। কিন্তু হেডকোয়ার্টার জশীপুর। জঙ্গলের সিং-দরজা। তিন চার দিক দিয়েই শিমলিপালে ঢোকার রাস্তা। কিন্তু, এটাই প্রধান। সবই শোনা কথা। ক'দিন ধরে বাবা পাখি পড়ানোর মতন

করে এই সমস্ত কথা আমাদের বলেছেন। মাকে আর আমাকে। তাতার বুকে 'L' লাগিয়ে বিপজ্জনকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। বাইরে বেরুলেই বাবা এই 'L' লকেটটা তাতারের বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেন, দেখেছি। কারণটা, তোমরা অনুমান করো। ঠিক বুঝবে।

এই তখন বেলা ছটো-আড়াইটে আন্দাজ হবে। আমি তো আর ঘড়ি পরি নে, কী করে বলবো? তবে, রোদ্দুর-ফোদ্দুর দেখে অমনটাই মনে হলো। সে মরুক গে, খৈরীদের জিপ চলে এলো। বাবা ইশারা করলেন ওপর থেকেই যে, আমরা এক্ষুনি নিচে নামছি।

তাতারকে যথারীতি কাঁধে তুলে বাবা মা আমি নিচে নেমে এলাম। বাবা চৌকিদারকে কী একটা বলার চেষ্টা করতেই সে জিব কেটে এক পা পিছিয়ে গেল। সেলাম করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গজ গজ করতে করতে বাবা বাংলোর মাঠ পার হতে লাগলেন, দিশ ইজ ব্যাড্।

কী ব্যাড্? মা আলতোভাবে প্রশ্ন করলো।

বাবা বললেন, আরে মুশকিল, পয়সাকড়ি কিছু নিল না। বললো, কালেকটর সাবকা অর্ডার নেই।

কোন কালেকটর? তোমার সেই বন্ধু না?

না রে বাবা। এটা আলাদা ডিসট্রিকট না? কালেকটর আলাদা হবে না? তুমি যেন—

এসব ব্যাপার বেশিদূর আমি গড়াতে দিই না। করি কী? মার আঁচল ধরে একটু টান দিই—আস্তে করে। মাও বোঝে। বুঝে পিছিয়ে আসে। বাবা গজগজিয়ে চলতে থাকে। বাড়িতে হলে, আমি ঘর থেকে শুট করে বেরিয়ে একচক্কর ফিকফিকিয়ে নিই। আমি জানি, এই সময়ে বাবার সঙ্গে তর্ক চলে না।

এবারে আমরা পুরো ফ্যামিলি জিপের পেছনে। সামনে, চৌধুরীসায়েব নিজেই হাল ধরে। পাশে খৈরীর পালিতা-মা নীহার মাসি। জিপের খাঁচাটা পুরো লোহার জালে ঘেরা। এমনটা তো

কখনো দেখিনি ?

বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে নীহার মাসিকেই প্রশ্ন করি।

উনি বলেন, এটা খৈরীর জিপ।

মানে ?

আগে খৈরী আমাদের সঙ্গে এখানে আসতো। ছোটো-মোটো ছেলেরা আর অনেকে ওকে কাঠি গুঁজে লাঠি গুঁজে জ্বালাতন করতো। যাতে ও রাগ করে কিছু না করে, সে-কারণ, এই জাল। তবে, খুব শান্ত আমার খৈরী। কাউকে কোনদিন কিছু বলেনি !

তাহলে ? আজ আসেনি কেন ?

মাসি হাসতে-হাসতে বলে, আজ ওকে আনলে তুমি কী করে ওকে দেখতে যেতে ? তোমার জিপ তো খারাপ হয়ে গেলো।

আমি চুপ করে যাওয়ায়, মাসি মুখ ফিরিয়ে থাকে। না রে, আজকাল ওকে আর আমরা আনি না। একে তো আসা-যাওয়ায় এভাবে ওর কষ্ট খুব বেশি হয়। তাছাড়া চৌধুরীসায়েব ভাবলেন, এতে খৈরীর ক্ষতি হতে পারে।

বাবা বল্লেন, ঠিকই, ওর মানসিক ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হতে পারে।

চৌধুরী বল্লেন, একজ্যাক্টলি।

এই প্রথম খৈরীর বাবার গলা শুনলুম। খুবই সাধারণ শান্ত গলা। বাবার থেকেও শান্ত, নরম। তাহলে ? এই গলায় কি বাঘ বশ করা যায় ? সার্কাসে কীরকম যণ্ডা-গুণ্ডা লোক যে বাঘের খেলা দেখায় ! আমি তাঁর দিকে অপলক চেয়ে থাকি ! মানুষটা পানও খায় দেখি মচর-মচর করে ? অবাক লাগে।

যেতে যেতে যে খৈরীর কতো গপপো শুনলুম, তা কী বলবো।

খৈরীর বাবা কিন্তু বারবার বলছিলেন, তিতি তুমি কিন্তু একটুও ভয় পাবে না। ভয় পেলেই ও ভয় দেখাবে।

বাচ্চাদের খুব পছন্দ করে খৈরী।

পছন্দ, মানে ?

আমি মনে-মনে ঘামতে থাকি। তাতার তো মা-বাবার কোল জুড়ে শুয়ে রয়েছে। ওর কোনো ভয়ডর-ই নেই। কষ্ট লাগে, আমি যদি ঠিক তাতারের মতন নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম। দেখছি, বড়ো হলেই যত বিপদ! রাস্তাটা কী সুন্দর, কী সুন্দর! দুপাশে জঙ্গল। আমরা পাহাড়ি চড়া বেয়ে উঠছি তো উঠছিই। বাঁক পড়ছে। ওদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে প্রায় গায়ের ওপর পড়তে চাচ্ছে গাড়ি-ঘোড়া। আমরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছি।
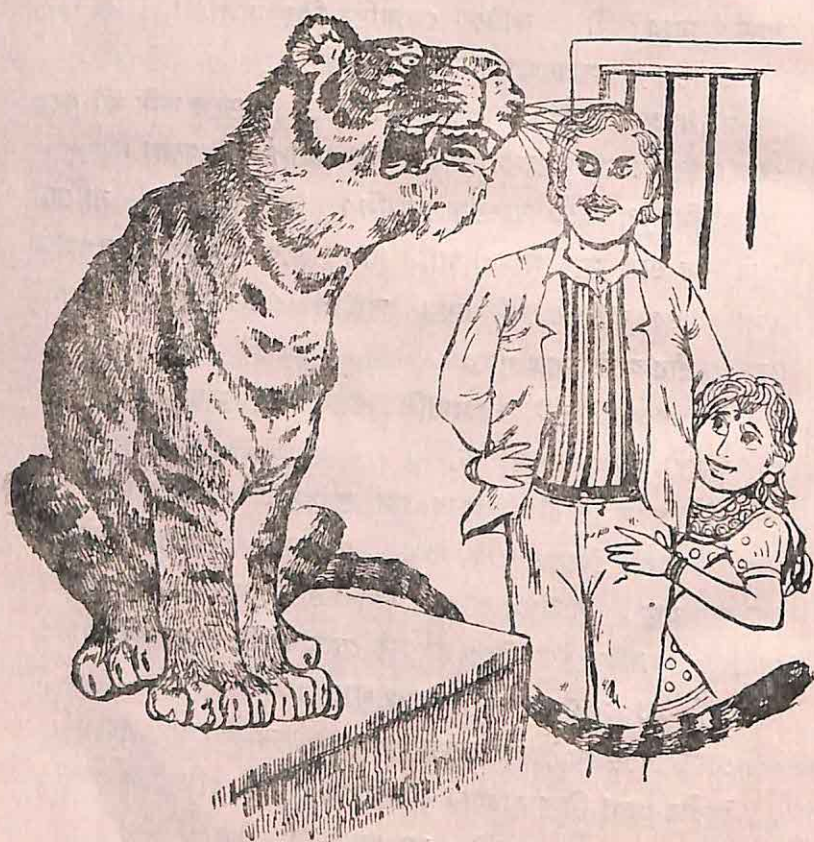
কখনো সমতল গোছের জায়গায় পড়লে দূরে দূরে আদিবাসি গাঁ। বাংরিপোষী না কী একটা জায়গায় একটু জল খেতে থামলুম।

টিউকলের জল যে এতো মিষ্টি হতে পারে, না খেয়ে দেখলে বিশ্বাসই হতো না। কলের গা থেকে মাটির কলসি আর বালতির রেশন কিউ। তারই ফাঁকে আমরা গেলাস গেলাস জল খেয়ে নিলুম। জিপ-গাড়িটাকে বেশ খানিকটা জল খাওয়ানো হল, আবার স্টার্ট।

সোজা জশীপুর। খৈরীর গুহায়! গুহা কথাটা এমনিই বললুম। গুহা মোটেই না। খৈরী-বাবা হর্ন দিতে দিতে একটা বন্ধ গেটের সামনে পেঁছুলে দারোয়ান গেট খুলতে এলো। আরো দু একজন লোক ভেতর থেকে গেটের দিকে। কিন্তু, ওদের সবার আগে দৌড়ে এলো ডোরাকাটা—বিদ্যুতের মতো। মরা বিকেলের আলো হলুদ কজ্জলে পড়েছে। উড়ে, এক লহমায় গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো সেই কজ্জল। হ্যাঁ, দাঁড়ানো ছাড়া আর কী বলবো?

হঠাৎ দেখি দুটো সায়েব-মেম একটা ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোনে দাঁড়িয়ে পটাপট ছবি তুলে যাচ্ছে। খৈরীর আদর খাওয়ার যেন শেষ নেই। এবার খৈরী আর তার মাকে ছেড়ে চৌধুরী আমার বাবার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ওর অভিমান দেখলেন? অন্য দিনের তুলনায় আজ আমাদের আসতে দেরি হয়েছে। দেরি হলেই ও এরকম ছদ্ম রাগ দেখাবে। এখন ও নীহারকে বহুক্ষণ ছাড়বে না। নীহারের ওপর সবচেয়ে জোর বেশি, তাই।

ফটোওয়ালারা বারান্দায় ফিরে এলে চৌধুরী বাবার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিলেন। মারকিন্ মুলুক থেকে এসেছে ওরা। বাঘের ব্যবহার নিয়ে ওরাও বহুৎ পড়াশুনো করেছে। বিশেষ করে, ঐ সায়েব। অলরাইট, না কি যেন নাম! পৃথিবীর সবাই একডাকে ওকে চেনে। সবাই মানে, এই যারা জন্তুজানোয়ার নিয়ে পড়াশুনো করে তাদের কথা বলছি। বাবাও ওর সঙ্গে কী সব যেন ইংরিজীতে বলছিলো—একবর্ণও কি তার আমি বুঝতে পারছিলুম?

বারান্দায় অনেকগুলো চেয়ার। মা তার একটা টেনে বসে পড়েছে। আমি দাঁড়িয়ে। বাবার কোলে তাতার। ঘুমন্ত।

হুটো নিয়ে বারান্দায় নেচে বেড়াতো।

মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি, মুখের চেহারা মোটেই স্বাভাবিক না। কেমন যেন শুকনো। কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর। আমার মতন উনিও আড়চোখে খৈরীর দিকে নজর রাখছেন। আফটার-অল একটা 'ছাড়া' প্রমাণ সাইজের বাঘ! খৈরী মৌরী সতী যে নামেই ডাকা হোক না, বাঘ তো?

খৈরী বারান্দায়। ধীরে ধীরে আমাদের দিকে। মা বাবা হুজনেই দাঁড়িয়ে উঠেছেন। আমি বাবার পেছন লেপটে। হঠাৎ মাসি হাঁক পাড়তে খৈরী বারান্দা থেকে উঠোনে। তারপর, আমাদের দিকে তাকাতে-তাকাতে এক্কেবারে বাড়ির পিছন দিকে। ওদিকেও জঙ্গল। চারিদিকে তারের জাল দিয়ে, বেড়া দিয়ে খৈরীর সদর আপিস করে ফেলা হয়েছে। একটা জিনিস সব সময়ই দেখছি, যেখানে খৈরী, সেখানেই তার পিছু পিছু একজন—নোটবই ঘড়ি আর পেনসিল নিয়ে। সর্বদাই টুকছে। খৈরী ছাড়া কিছু জানে না সে।

এই উঠে দাঁড়ানোতে চৌধুরী একটু অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট না বলে, হুঃখিত বলাই ভালো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করা?

চৌধুরী বললেন, খৈরীকে একবার শুঁকতে দেবেন, প্লিজ। এই গন্ধ নেওয়া মানেই ও আমাদের চিনে রাখলো। বাবা 'বেশ তো বেশ তো' বলতে থাকেন।

মা সোজা বলে ফেলে, আচ্ছা চৌধুরী সায়েব রাত্তিরটা অন্য কোথাও থাকার—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করতে হবে। আমি প্রোভিশনাল ব্যবস্থাও করেছি একটা। বেলজিয়াম থেকে আমার এক গেস্ট আসার কথা। সমস্যা বিরাট, মাত্র হুটো গেস্টরুম। জায়গাই দিতে পারি না। আমি আপনাদের জন্যে ঐ বাজারের কাছে একটা হাইওয়ে বাংলো বুক করতে বলেছি। ওয়ান রুম। বাকি তিনটে রুম ভর্তি। বারান্দাতেও লোক থাকবে ওখানে, দেখবেন। এখানে থাকার জায়গার খুবই

সায়েব মেম ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পাশাপাশি দুটো ঘরের একটা এখনো খালি। ওটাতেই বোধহয় আমরা থাকবো!

কী রে? বাবা শুধোন।

ঈশ, কী বিচ্ছিরি গন্ধ বাবা! আমরা কি এঘরটায় থাকবো নাকি? অসম্ভব?

বাবা ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে চুপ করে যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি চৌধুরী এদিকে আসছেন। মেক ইয়োরশেলফ কমফরটেবল। বসুন, বসুন।

বাবা বসলেন, তাতার কাঁধে। আমি কাঠ দাঁড়িয়ে। খৈরী যে তার মাকে নিয়ে কী করছে! উঠোনের একপাশে দুটো বড়ো বড়ো চৌকি পাতা। সেখানে মাসির কোলে খৈরী মাথা পেতে দিয়ে এক্কেবারে ওলোট-পালোট খাচ্ছে।

অন্য কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই তার।

কী আশ্চর্য! ভাবি আমরাও তো কখনো এরকম করিনা। খৈরীর ভারে মাসি হেলে হেলে পড়ছে। মাসি ওড়িয়া ভাষায় কতোরকম ভাবে আশ্বস্ত করছেন। সবটা ছাই বুঝতে পারছি না। গেটের কাছে বেশ কিছু দর্শক। এদিক-ওদিক থেকে যতো গাড়ি যাচ্ছে, তারা একবার করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে গেটের বাইরে থেকে খৈরীকে দেখে যাবার চেষ্টা করছে। হয়তো, বহুবারই দেখেছে। তবু, এ দেখার যেন শেষ নেই। মানুষ আর বাঘের এই স্নেহ ভালোবাসার কথা ভাবাই যায় না!

এক সময় হঠাৎ মাসিকে ছেড়ে দিয়ে খৈরী ডানহাতি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। তখনো একটু-একটু আলো আছে। এদিকে সন্ধ্যে হতে একটু দেরীই হয়, দেখা যাচ্ছে।

বাবা মা চৌধুরী আংকল চা খাচ্চেন। আমাকে এক প্লেট বিস্কুট দেওয়াও হয়েছে। আহা, বিক্কু' এখনো জাগেনি। জাগলে দু, হাতে

অভাব। গভর্নমেণ্টকে বলেছি। মা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সেই সঙ্গে আমিও। জানিনা, বাবার ব্যাপারটা কী? উনি ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। যাই হোক, মোদ্দা, যাবেন তো একসঙ্গে। যেতে তো হবেই। এখানে 'নো ভেকেনসি।'

খৈরী কখন উঠোন থেকে দৌড়ে বারান্দায় এবং বারান্দায় উঠে আমার দিকে নিঃশব্দে তেড়ে এসে ডান থাবা দিয়ে পায়ে টান মেরেছে—টের পেতে-না-পেতেই চিল চিৎকার। বাবা মা চৌধুরী সবাই হৈ হৈ, না হায় হায় করে উঠেছিলো, আজ আমার তা মনে নাই। সেদিনও ছিলো না। কানেই ঢোকেনি। মনে আছে, এ হেন চিৎকারে লজ্জা পেয়ে খৈরী (মনে হলো লেজ গুটিয়ে) বারান্দা থেকে ঝুপুৎ। তারপর একদম নিখোঁজ। যতক্ষণ সেদিন ছিলুম খৈরী বেপাত্তা। মাসি কতো ডাকলো। আংকল ডাকলেন। কোথায় খৈরী?

আমার সত্যি কিছু হয়নি। তবু, কান্না থামছিলো না। আংকল টর্চ এনে, তিনি এবং নীহার মাসি হাঁটুর পিছন দিকটা তন্ন তন্ন করে দেখে হাসলেন। মা বাবার মুখের হাসি ফিরবে বলে মনে হলো না। অলরাইট, সায়েব মেম দুজনেই বাইরে। আংকল বুঝিয়ে বলছিলেন, খৈরীর তিতিকে ভালো লেগেছে। ও নাকি আমাকে ওর খেলার সঙ্গী হিসেবে ডাকতে এসেছিলো! থাবার মধ্যে নখগুলো মুড়ে, যাতে আমার একটুও না লাগে, তেমন একটা ছোট্ট ইয়ার্কি টান মেরেছিলো সে। আর তাতেই ওর এতো হেনস্তা! কান্না থামতে আংকল তুলোয় ভিজিয়ে ডেটল-ফেটল এনে ঘষে দিয়েছিলেন আমার হাঁটুর পেছনে। কান্না থেমেছিলো বটে, কিন্তু সত্যিই, পরদিন শুনেছি— আমরা অন্যত্র না যাওয়া পর্যন্ত খৈরী আর সেদিন আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে নি।

খৈরীর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু, এই শেষ নয়। অনেক গপ্পো আছে। আজ তা থেকে, তোমাদের একটু ধরতাই শুনিয়ে দিলুম।

তিতিকে খৈরীর গল্প

বাবার কাছে শোনা। আমার সাক্ষাৎ দেখা নয়। তবে, যেহেতু খৈরীকে নিয়ে কথা, আমি কান পেতে শুনেছিলুম। আন-কথা হলে কিছুতেই শুনতুম না।

বাবা, সুনীলকাকু (গঙ্গোপাধ্যায়) এ্যানড কোং একদিন হঠাৎ ঠিক করে ফেললো, ওরা খৈরী দেখতে যাবে। তবে, ঘুরে ঘুরে— ঝাড়গ্রাম-বারিপদা হয়ে খৈরী।

বললুম, পৌঁচেছিলে তো শেষ পর্যন্ত! তোমাদের যা ব্যাপার-স্যাপার।

এবার কপট-গম্ভীর বাবা বললো, শোনোই না আগে। মন্তব্য পরে করো।

দলে জনা আষ্টেক সবশুদ্ধু। অপিসের সামনে কার-না-কার একটা জিপ দাঁড়িয়ে। বেশ বিধ্বস্ত চেহারা। ওপরে খবর যেতে সুনীল আর আমি নেমে এলুম। দুই যমদূত দাঁড়িয়ে ঠিক রিসেপসনের নিচেই। বললো, তৈরি তো?

নিশ্চয়।

তাহলে চলো। বড়ো রাস্তার ধারে গাড়িটা রাখা আছে; তোমাদের গলিতে তো গাড়ি রাখার একচুল জায়গা নেই।

ঠিক আছে, চলো।

টেলিফোনের ঘর থেকে দুজনে ছোট দুটো বাক্স নিয়ে বাইরে। সামনে জঙ্গল। তার পিছনভাগে খাদ্যপানীয় হুড়মুড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

এতেই যাওয়া হবে নাকি? সুনীলের প্রশ্ন।

কে যেন উত্তর দিল, হ্যাঁ, এতেই যাওয়া—কিন্তু, হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। সেখান থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রামে রাতটা কাটিয়ে,

পরদিন রামলালের কাছ থেকে একটা এ্যামবাসাডর জোগাড় করে সোজা বারিপদা। বারিপদা থেকে সিমলিপাল পাহাড়ে একটা খুবই অজানা অপরিচিত এবং অবশ্যই দুর্গম দিক ভেঙে ওঠা। প্রথমেই পড়বে লুলুং। পরে ভঞ্জবাসা। ঐ ভঞ্জবাসাতেই ময়ূরভঞ্জ-রাজের শিকার বাড়ি। সেই শিকার বাড়িতে, পারলে একটা রাত কাটিয়ে মহাদুর্গম সিমলিপালে ঢোকা। খৈরী কিন্তু পাহাড়ের একেবারেই উলটোদিকে।

চাহালা বা নুরানায় থাকে। তবে, চাহালাতেই বেশি। সিমলিপালে না থাকলে, থাকে জঙ্গীপুরে টাইগার প্রজেকটের বাংলো সংলগ্ন ঘেরা তৈরী করা জঙ্গলে। কলকাতা থেকে যতটুকু খবর যোগাড় হয়েছিল, তাতে জানা গেছে খৈরী জঙ্গীপুরেই আছে।

যাই হোক, বারিপদা পৌঁছে একটা তালাস করা যাবে। সরাসরি ফোন করা যাবে খৈরীর মানুষ বাবা সরোজ রায়চৌধুরীকে। আরেকটা কাজ অবশ্য সহজেই করা যায়। আমাদের আনন্দবাজারের নিজস্ব সংবাদদাতা অমরেন্দ্রলাল বসু থাকেন বারিপদায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে, তিনি ঠিক খবরটা দেবেন। কেননা, খৈরীর ব্যাপারে তিনিও অন্যতম উৎসাহী সাংবাদিক। প্রকৃতপক্ষে, খৈরীর নিউজ প্রথম তিনিই কাগজে পাঠান। প্রথম ছাপটা তাঁরই হয়। পরে অবশ্য, অনেকেই খৈরীর তথ্য লিখছেন। ছবি হয়েছে। আর আজকাল তো প্রায়ই দূরদর্শনে আমাদের মতো তিতির দল খৈরীকে আকছার দেখতে পাচ্ছে।

আজ তিতি খৈরীকে আর দেখতে পাবে না। কেননা, সে নেই। তার এই না থাকাটা যে কত মর্মান্তিক, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। শিশু-কিশোরদের ভালোবাসার সিংহাসন খালি করে আজ খৈরী চলে গেছে।

হ্যাঁ, বাবাদের দলটি বারিপদা গিয়ে জানতে পারে খৈরী জঙ্গীপুরে। ওঁরা যে যাচ্ছেন, সে খবরটুকুও চৌধুরী সায়েবকে দেওয়া হয়ে যায়,

যাতে তিনি একটু প্রস্তুত থাকতে পারেন।

লুলুং হয়ে যাওয়া স্থগিত রাখতে হলো অবশ্য। যে ব্যাংক-অফিসারকে জিপ যোগাড়ের ভার দেওয়া হয়েছিল, সে সময় ওড়িশায় নির্বাচন পড়ায় সরকার অধিকাংশ জিপই রিকুইজিশন করে নিয়েছিলেন।

আমাদের সঙ্গে এ্যামবাসাডর। জঙ্গলের পথে এ-গাড়ি পুরো-পুরিই অচল। তবে, জঙ্গীপুর পর্যন্ত এ-গাড়িতে সুন্দর যাওয়া যাবে। ব্যাংকের ভদ্রলোক ভরতপুরে শুধু মিষ্টিমুখ করলেন। অথচ ভাত-মাংসের লোভ দেখানো হয়েছিলো। আমাদের সঙ্গী বুড়োর উনি জামাইবাবু। ফলে, বুড়োর অবস্থা যে কী রকম করুণ হয়ে উঠল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পার্থ চৌধুরী তো স্পষ্টই বলে বসলো, হাইওয়ে-ধাবার দুপুরের খাবার খরচ বুড়োর। অল্পের ওপর সামান্য ফাইন। ক্রমশ ফাইল করতে করতে যাওয়া হবে। রাজি?

একবাক্যে সবাই রাজি।

বিকেল পার হয়ে জঙ্গীপুর। তখনো সন্ধ্যে হয়নি। চৌধুরী সায়েব এগিয়ে এলেন। দরোয়ান দরজা খুলে দিলে গাড়ি ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলো। চৌধুরী বলেছিলেন, ঘাবড়াবেন না। খৈরী বনেটের উপর যে কোনো সময় লাফ দিয়ে উঠতে পারে। তবে ওর ভারে বনেট না তুবড়ে যায়! স্টীয়ারিং এখন বুড়োর হাতে। এবং তা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চৌধুরী নীহার সামনে—আমরা ওঁদের পেছনে পেছনে হাঁটি হাঁটি পা পা। কখন তাঁর দর্শন মিলবে হঠাৎ।

মুখে রা কাড়ছিনা। সবাই একটা চাপা টেনশনে আছি। তার মধ্যে আমিই যা একটু নির্ভয়। আমি দু তিনবার এসেছি। খৈরীর প্রকৃতি জানি। আর ওদের কেউই আগে আসেনি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমরা বারান্দায় গোল হয়ে বসে কথাবার্তা বলছি। কথা বাস্তবিক, চৌধুরী সায়েব আর নীহারই কইছেন।

আমরা শুনছি। সব কথার কেন্দ্রে ঐ খৈরী।

দূরে জঙ্গলে খৈরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যেও উঠোনে চলে আসছে। হঠাৎই বারান্দায়। গৃহপালিত কুকুরের মতো বনের রাজা বাঘ বেড়াচ্ছে ঘর দুয়ারে, উঠোনে বারান্দায়।

সুনীল বসেছিল ডানহাতি শেষ চেয়ারে। বেশ আরাম করে, চেয়ারের হাতলের থেকে বাইরে কনুই। হঠাৎ কথা নেই, খৈরী দৌড়ে এসে সুনীলের একটা কনুই ওর বিশাল হাঁ-এর মধ্যে টেনে নিল।

সবাই কেমন একটু থতমত খেয়ে গেছে। এমন কি, চৌধুরী নীহারও। আমি দেখছি সুনীলের মাথার চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর নীহার ক্রমাগত বলে চলেছে, সুনীল, ও খৈরী খৈরী বলুন, আদর করে। কোথায় আদর? সুনীলের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। বেরুনোর কথাও না। আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। দম বন্ধ করে, কুলকুল ঘামছি। কী করা যাবে না যাবে, বুঝতে পারছি না। নীহার খৈরীর নাম উচ্চারণ করে যাচ্ছে পাগলের মতো। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন····হঠাৎই একটা সময় খৈরী সুনীলকে ছেড়ে দিয়ে পার্থসারথির দিকে। আবার এ্যাবাউট টার্ন করে উঠোনে।

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, চৌধুরী, জঙ্গলে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আজই, এক্ষুনি। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না। অসম্ভব। পার্থ প্রভৃতির সব এক কথা। আর নয়। চলো জঙ্গলে। চলো বললেই তো আর চলা যায় না। দুদিনের রসদ জিপে তুলে নিতে হবে। চাল ডাল তেল নুন সবই। মুরগিটা হয়তো ওখানে মিলতে পারে। তাও নিয়ে নেওয়া ভালো!

সুতরাং, চলো বাজারে। তারপর জিপ তো পাওয়া যাবেই এবং বেশ ভালই ভাড়া লাগবে।

চৌধুরী দারুণ ব্যবস্থা করলেন। জিপের ব্যবস্থা তো করে দিলেনই,

সেই সঙ্গে এসি. এফ-কে দিলেন গাইড হিসেবে। এসি. এফ ইনসপেকশনে চললেন আমাদের সঙ্গে। জিপের কোনও চার্জ লাগল না।

অন্ধকারে এসময় জঙ্গলে ঢোকা বারণ। অপরাধই বলতে হবে। চৌধুরী এসি. এফকে বলেও দিলেন সে কথা। সাবধানে গাড়ি চালিয়ে যেতে বললেন। জিপে ওয়ারলেশও রইলো। প্রয়োজনে চৌধুরীর সঙ্গে জঙ্গীপুরে যোগাযোগ করতে বলে, নিজেকে বিদায় জানালেন। রামলালের এ্যামবাসাডর ওখানে রয়ে গেলো। জিপ দিয়ে এ্যামবাসাডর নিতে হবে। ইচ্ছে, জঙ্গলে দু' তিন দিন থাকা অন্তত, এবারের মতো।

ফুলবাগান। সার বেঁধে ইউক্যালিপটাস দেয়ালের পাশে। রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড সব বিলিতি শিরীষ গাছ। রাস্তার ওপরই ছায়া আর রোদ্দুর। ছায়া বেশি, রোদ কম। করলা নদীর খুব কাছেই এই সারকিট হাউস। করলা শহরটাকে দু'ভাগ করে মধ্যিখান দিয়ে গেছে। একটা মুখ তিস্তার ওপর। বুড়ি তিস্তার। সেখানে লকগেট, বাঁধের গায়ে। জ্যেঠুর গাড়িতে গোটা শহর ঘুরে-বেড়িয়ে দেখেছে তিতি। আরো কত দেখবে। দেখতেই তো আসা। সেই গিজগিজে কলকাতা থেকে এই এত দূর দৌড়ে এসেছে—উত্তরবাংলার নদীনালা জঙ্গল দেখবে বলে। এই একটা জায়গাতেই যেন সবুজের ওপর খুব বেশি একটা ধুলো পড়ে নেই। সবুজ ঠিক সবুজের মতন এখানে। এই জায়গাটার নাম জলপাইগুড়ি। গুড়ি মানে জঙ্গল। কোনোকালে এখানে নিশ্চয় জলপাইবন ছিলো। আজ নেই। এখানে গুড়ি আর মারি-র ছড়াছড়ি। শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি—কতো যে গুড়ি তার ঠিক ঠিকানা নেই। তেমনি মারি আর কাটা-তে ভর্তি।

শালগাছের আঠা থেকে ধূপধুনো হয়, তিতি জেনেছিলো। এখানে শাল-সেগুনের জঙ্গল সব দিকেই—যে দিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই লম্বা আকাশ-ছোঁয়া সব গাছ। তলায় শুকনো পাতা ছড়ানো। সেগুন-মঞ্জরী থেকে এক তীব্র গন্ধ বের হয়। মানুষ আর বনের পাখিকে মাতাল করে এক ধরনের মিশ্র বন্যগন্ধ। তিতির কেমন ঝিম লাগে। এই ঝিম এ-জায়গায় বনে-বনান্তরে জড়ানো। এই নিয়ে কতোবার যে হলো, তার এদিকপানে। বাবা-মার সঙ্গে। এবার, উপরি হিসেবে হাসিখুশি বইয়ের মতন বাবার এক বন্ধু এসেছেন। গোমড়ামুখো লোক দেখতে তিতির একদম ভাল্লাগে না। এই হিমকাকু সব্বাইকেই হাসান। এমনকি বাবাকেও। অদ্ভুত সব গপ্প বানান। ছড়া বানান মুখে-মুখে। ছড়ার মতন ছড়িয়ে, তিতি গেলেন গড়িয়ে।

বাংলো রোডের ওপর সারকিট হাউস। বিরাট তার চৌহদ্দি। ঘাস জমি। মাঝখানটায় অর্থাৎ বাংলোর বারান্দার সামনেই

তা গড়িয়ে গেলো কোথা ? ব্যাঙের মাথা। কী ব্যাঙ ? কোলা-ব্যাঙ। কী কোলা ? আপন ভোলা। কার আপন ? শীতের কাঁপন। তা, শীতটা পড়েছিলো বটে। কী শীত, কী শীত ! ঠাণ্ডা জলে হাত দিয়েছো কি—হাত কাটলো। পা ডুবিয়েছো কি পা। চান-ফান মাথায় উঠেছে। উত্তুরে হাওয়া বয়। হাড় ক'খানায় বাজনা বাজ্ছি। তিতি গড়াতে-গড়াতে গিয়ে পৌঁছুলো কালীঝোরা। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি হয়ে ঘণ্টা খানেক মাত্তর। আঁকাবাঁকা পথের চড়াই ভেঙে, উৎরাই-এ নেমে শুধু গোল্লাছুট। তিস্তা তোমায় ছাড়ছে না। একবার এপাশ, একবার ওপাশ। ধপাস তো যে কোনো সময় হতে পারে। আর ধপাস হলে, দেখতে হবে না। নিচে গভীর আর ভয়ংকর খাদ। খাদের দিকে চোখ গেলে বুক-মুখ সব শুকিয়ে আমসি। পাহাড় কেটে পথ। কখনো ডানে যাচ্ছে, কখনো বাঁয়ে। এইভাবে চলছে তো চলছেই আমাদের জিপগাড়িটা। আমাদের মানে কী ? ঐ জ্যেঠুর দপ্তর-খানার গাড়ি। জ্যেঠু এই উত্তরবাংলার পুলিশের সবার বড় কর্তা। কিন্তু, জ্যেঠুকে দেখে কখ্খনো তার পুলিশ মনে হয় না। কী সুন্দর দেখতে জ্যেঠুকে ! কী টকটকে গায়ের রক্তবর্ণ। সে-জায়গায় বাপকে তার বেশ কালোই লাগে। মা-র রং টকটকে ফকফকে। কিন্তু, মা তো আর জ্যেঠুর ভাই না ? কালীঝোরা বাংলোটা পাহাড়ের মাথায় শক্ত করে বসানো। রাস্তার দিকে পিঠ ফিরিয়েই আছে। সামনে চর। চরের—পাশে তিস্তা। বাংলোর ডানহাতি কালী গিয়ে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। কালীর রং কালো। সেই কালো রং, তিস্তাকেও কালো করে দিচ্ছে। একটু দূরে শ্বেতী। সাদা রং। কালীর তুলনায় তো বটেই। কালী কেন কালো ?

হিমকাকু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ওঃ এটুকুই জানো না ? তাহলে শোনো। এক টুকরো কয়লা নিয়ে এসো চৌকিদারের কাছ থেকে

চেয়ে। আধ মগ জলও এনো। আচ্ছা, শোনো তিতি—কাঠকয়লাই কয়লা।

তিতি কয়লার একটা টুকরো বাংলোর পেছনকার রান্নাঘর থেকে নিয়ে এলো। চৌকিদার ছিলো না। জল তো বাথরুম থেকেই পাওয়া যাবে। সুতরাং—

হিমকাকু চেয়ার থেকে নেমে সিঁড়ির ওপর উঁচু হয়ে বসলো। বসে কাঠকয়লার টুকরোটা ঘষতে শুরু করলো ঘ্যাস-ঘ্যাস করে। গুঁড়ো গুঁড়ো কয়লার ওপর একটু একটু করে জল ঢালতে শুরু করলো। একসময় একটু বেশি ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, এই তো আরেক কালী। কালীঝোরা। নির্ঘাৎ, কালী যে-পথের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে, তার নিচে, কোথাও-না-কোথাও কয়লা লুকনো। আমরা এখনো জানিনা, ঠিক কোন্ জায়গাটায় কয়লা আছে। একদিন নিশ্চয় জানতে পারা যাবে। 'উত্তরবাংলায় কয়লার সন্ধান'— এই হেডিং-এ আনন্দবাজারে জোর খবর বেরুবে। আর আমরা অনমিত্র-র দিকে যেটা ঠেলে দিয়ে বলবো, ঠিক ঠিক লেখো কিন্তু! জোর খবর। তুমি প্রায় যেমন কর, তেমনি কিছু করে বসো না কিন্তু।

সেই অনমিত্রকাকু? যাঁর সঙ্গে তোমরা কাজ করো?

হ্যাঁরে বাবা, হুঁ। অনমিত্তির আর কজন আছে? ওএকাইএকশো। কী করছিলো, বা কী করতে পারে? ও ভাবে, উত্তর বাংলায় আবার কয়লা কোথায়? নিশ্চয়, এজেনসি টাইপ করতে গিয়ে ভুল করেছে। ও তো অনেক জানে! আমাদের মতন বোকা হাবা না। বিশেষ করে ভূগোল বিজ্ঞান তথা ভূবিজ্ঞানের ওপর ওর দখল প্রশ্নাতীত। সব্বাই একবাক্যে স্বীকার করে আপিসে, হ্যাঁ, জানে বটে অনমিত্তির। অখণ্ড অনমিত্তির খণ্ড খণ্ড বলতে কিছু নেই। একেবারে বাঁধানো গীতবিতান বলতে পারো, যেমন তোমার মার আছে তেমনি। সে থেকে উত্তরবাংলায় কয়লার সংকট। সংকট কথাটা ও বিবেচনা

করে বসায়। এমন বিবেচনা ওকে প্রায় করতে হয় কিনা!

কী সুন্দর, কী সুন্দর এই কাঠের বাংলোবাড়িটা। যেন সগ্‌গে চড়ে আছে। চরের পাথরগুলোরই বা কী রং! সবুজ, নীল, রকমারী সব রং। ছোটবড়ো নানা আকারের। আর ঝকমকে মোলায়েম বালি। সিল্কের বালি যেন। হাত দিলে হাত পিছলে যায়। সেই বালুচরের ঠিক গা ঘেঁষেই চলেছে তিরতিরিয়ে তিস্তা। তিনটে স্রোত মিলিয়ে একস্রোতে। তিস্তা মানে তো ত্রিস্রোতা-ই। হিমকাকু তিতিকে বলেছিলো একদিন।

যে সময়ের কথা, তা হলো এই পুজোর সময়টা। আকাশটা ঝকমকে নীল, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ভেড়ার মতন সাদা জাবড়া জাবড়া মেঘ। শীতের কনকনে বাতাস। বেলা পড়ে আসছে আর বালি পর্যন্ত হিমঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বালি নিয়ে খেলা করে তিতি আর তিতির ভাই তাতার। বড়রা সবাই তিস্তার দিকে চোখ-কান মেলে বসে থাকে। বসেই থাকে। কী যে ভাবে কে জানে? তিস্তার কথা কিছু কি শুনতে পায়?

নদীর ওপারে পাহাড় আর জঙ্গল। বাংলোর চারদিকেই পাহাড়। একটা উপত্যকার মতন জায়গাটায় এই বাংলো যে কতো সুন্দর, তা যে না দেখেছে, সে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। চরের বুক থেকে কুড়িয়ে এনে ঘরের একটা কোণ ভরিয়ে ফেলেছে তিতি। তাতার খুব খুশি। তাদের একটা আলাদা পাহাড় তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই। শুধু মার জন্যেই যা একটু ভয়। মা সকালেই ওগুলোকে ঘরের বাইরে বার করতে বলবেন ঝাড়ুদারকে। আবার কুড়িয়ে আনতে হবে, এই যা!

ওপারে পাহাড় থেকে মাঝেমধ্যে চরে হাতি নামে। তাই তাড়া। নয়তো চরেই বুঝি গোটা রাতটা কাটিয়ে দিতো তিতি। তাই তো ইচ্ছে তার। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর শব্দ বাড়ে। বাংলোর পেছন দিককার পথ পেরিয়ে ট্রাক-বাস যায়। এটুকু ছাড়া, কী নির্জন

কী নির্জন এই দিকটা। বাজার বহুদূর। কাছাকাছি কোন মানুষজন নেই। মাঝেমধ্যে নাইটজার ডেকে ওঠে। রাতটুকু একটু ভয়-ভয় লাগেই। চারদিকে কতো ছায়া ঘুরে বেড়ায়। আর, এই সুযোগে হিমকাকু ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করে, বুঝলে তিতি—কিছু কিছু ছায়া আছে, যাদের কিন্তু ঠিক মানুষের মতনই হাত পা চোখ মুখ মন কান সব আছে। শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আবার আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ মাঝেমধ্যে দেখে ফ্যালে। দেখে ভয় পায়। আর ভয় পেলে—

তিতি চমকে ওঠে।

হিমকাকু বলে, না না, তোমার ভয় পাবার কী আছে? আমরা তো সঙ্গে আছি। তবু কোথাও একা একা না যাওয়াই ভালো। বিশেষ করে নদীর চরে। নদী থেকে কখনো কখনো উঠে পরমাসুন্দরী এক কন্যে পাথর কুড়োয়। শুনেছিলুম, পাথর কুড়োতে কুড়োতেই সে নদীর জলে পড়ে যায়। সেই থেকে ওখানেই তার ঘরবাড়ি। এখন ঠিক তার বয়সী একটি-দুটি বন্ধু খুঁজতে সে মাঝেমধ্যে নদী থেকে চরে ওঠে আর ঘুরে বেড়ায়॥

—:—